গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৭ বর্ষ ২২ সংখ্যা ৪ - ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থনে ভাস্বর ২৮ জানুয়ারির মহামিছিল

গোটা দেশ জুড়ে বামপন্থী আন্দোলনের দুর্বলতা, বিশেষ করে সি পি এমের চূড়ান্ত জনবিরোধী ও আন্দোলনবিরোধী ভূমিকার সুযোগ নিয়ে শাসকশ্রেণী ও তাদের তল্পিবাহক সংবাদমাধ্যমগুলি বেশ কিছুদিন যাবৎ মিছিল-বন্ধ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সুপরিকল্পিত প্রচার করে চলেছে। তারা ক্রমাগত বলে চলেছে, সাধারণ মানুষ মিছিল চায় না, মিছিলে রাস্তা আটকে গেলে মানুষ বিরক্ত হয়। অথচ মানুষের জীবন-জীবিকার দাবি নিয়ে প্রকৃত জনস্বার্থে গণআন্দোলন গড়ে তোলার ধারাবাহিকতায় যদি মিছিল হয় এবং তার প্রতি পদক্ষেপে-স্লোগানে-শৃঙ্খলায় যদি তা মূর্ত হয়ে ওঠে, তবে তা জনসাধারণের কী বিরাট স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন পেতে পারে, তারই এক জীবন্ত সাক্ষী হয়ে থাকল ২৮ জানুয়ারির কলকাতা। শ্যামবাজার থেকে কলেজ স্ট্রিট হয়ে ধর্মতলা পর্যন্ত সেদিন এস ইউ সি আই-এর মহামিছিলের দু'ধারে অপেক্ষমান মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসাহ ও সমর্থন যে-কেউ দেখেছে, সেই বলতে বাধ্য হবে যে, মিছিলবিরোধী মিডিয়ার টানা প্রচার অন্তত এস ইউ সি আই-এর মিছিলের ক্ষেত্রে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। সেদিন অধীর আগ্রহে মিছিল দেখেছেন হাজার হাজার মানুষ। এই মিছিলের দাবি, মিছিলকারীদের দৃপ্ত স্লোগান, শৃঙ্খলা, সাধারণ মানুষকে কাছে টেনেছে — আশায়, আগ্রহে তারই প্রতিফলন ঘটেছে মানুষের প্রতিটি অভিব্যক্তিতে। মিছিলের শৃঙ্খলা দলের প্রতি আস্থাকে কতটা দৃঢ়মূল করেছে, তা বোঝা যায় রাস্তার প্রবীণ মানুষটি যখন মন্তব্য করে ওঠেন, 'দেখেছো এদের শৃঙ্খলা ! অন্য কোন দলের মধ্যে এ জিনিস নেই। আমাদের দেশে রাজনৈতিক আন্দোলনে এই শৃঙ্খলা প্রথম নিয়ে আসেন সুভাষ বোস।'

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে ১৯ দফা দাবিতে এই মহামিছিলের ডাক দিয়েছিল এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। গণ আন্দোলনের দীর্ঘ ধারাবাহিকতাতেই এই মহামিছিল। মিছিলের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল অনেক আগে থেকেই। প্রথমে ২৯ সেপ্টেম্বর, পরে ৬ অক্টোবর প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাতিল করতে হয় মহামিছিলের কর্মসূচি। ইতিমধ্যে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সহ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-এর ডাকে ১৭ নভেম্বর পালিত হয়েছে অভূতপূর্ব বাংলা বন্‌ধ ; বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ২৫ নভেম্বর রাজ্যব্যাপী আধঘন্টা আলো বর্জনের কর্মসূচিতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামিল হয়েছেন রাজ্যের মানুষ। ১৯ দফা দাবির সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ আগে থেকেই চলছিল, বাংলা বন্‌ধের পর স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান তুঙ্গে ওঠে। গ্রামে-শহরে, হাটে-বাজারে,

চারের পাতায় দেখুন

বুদ্ধদেববাবুদের শিল্পায়নের ফানুস বহু পূর্বেই ফেঁসে গেছে

সম্প্রতি শিল্পপতি ও বৃহৎ ব্যবসাদারদের সংগঠন সি আই আই-এর সঙ্গে 'পার্টনারশিপ সামিট' হয়ে গেল কলকাতায়। ঠিক তার পরে পরেই একটি ছবি প্রকাশিত হয়েছে বাংলা দৈনিকের পাতায় ; একদিকে দাঁড়িয়ে টাটা কোম্পানির কর্ণধার রতন টাটা এবং তাঁর পাশেই কৃপাপ্রার্থীর দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী (!) মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এই বাংলার ঘরে ঘরে টাটা-বিড়লার নাম পরিচিত হয়েছে পুঁজিবাদী শোষণের প্রতীক হিসাবে, স্বাধীন ভারতে আপামর জনগণের গরিবির কারণ হিসাবে। এই সত্য কি উল্টে গেল বুদ্ধদেববাবুদের কল্যাণে ? এখন টাটা বিড়লাদের কাছে কৃপাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে বুদ্ধদেববাবুদের !

কিন্তু বুদ্ধদেববাবুরা এতে আর আজকাল বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না, সঙ্কুচিতও হন না। বরং তাঁরা খুশিতে গদগদ। তাঁরা শিল্পপতিদের বাহবা পাচ্ছেন, তাঁদের বক্তৃতা শুনে শিল্পপতিরা হাততালি দিয়ে অভিনন্দন জানাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং মুখ্যমন্ত্রীকে 'দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রী' বলে সার্টিফিকেট দিচ্ছেন। আর কী চাই ! কিন্তু প্রশ্ন হল, একদিন শিল্পপতিগোষ্ঠী ও কংগ্রেসের থেকে কটূক্তি, নিন্দা ও তিক্ত সমালোচনা এলে যে বামপন্থীরা নিজেদের চরিত্র সম্পর্কে নিঃসন্দেহ থাকত যে তারা নিশ্চয় ঠিক পথে চলছে, তারা গরিব সাধারণ মানুষের পক্ষেই কাজ করছে, কেন আজ সেই শিল্পপতিগোষ্ঠী ও কংগ্রেস তাদের প্রবল প্রশংসা করছে, সার্টিফিকেট দিচ্ছে, একথা ভাববার মতো অবস্থা কি আজ তাদের আছে ?

মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের সভায় বলেছেন, 'লেফ্‌ট ইজ রাইট', অর্থাৎ বামপন্থীরা ঠিক পথেই চলছে। কিন্তু এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ এ কথাটার ভিন্ন অর্থ করছেন। তাঁরা বলছেন, বুদ্ধদেববাবু মুখ ফস্কে সত্য কথাটা বলে ফেলেছেন ; 'লেফ্‌ট ইজ রাইট'—অর্থাৎ বুদ্ধদেববাবুদের বামপন্থাই এখন যথার্থ দক্ষিণপন্থা। বুদ্ধবাবুদের বামপন্থা এখন শিল্পপতি ও কংগ্রেসের প্রশংসা পাওয়ার জন্য লালায়িত। একথার অর্থ এমন নয় যে, ওঁরা আগে খুব বামপন্থী ছিলেন, এখন দক্ষিণপন্থী হয়ে গিয়েছেন, যদিও জনসাধারণ তাঁদেরই প্রকৃত বামপন্থী বলে মনে করতেন, কিন্তু প্রকৃত বামপন্থী ওঁরা কোনকালেই ছিলেন না। তবে আগে সরকারি ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য গরিব সাধারণ মানুষের স্বার্থে যতটুকু আন্দোলন তাঁরা করতেন, ক্ষমতায় বসে সেই ক্ষমতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সেটাকেও তাঁরা বাদ দিয়েছেন।

বামপন্থী আন্দোলনকে পরিত্যাগ করে শিল্পপতি-ব্যবসায়ীদের সঙ্গে গলাগলি করে চলার তাঁদের বর্তমান কার্যকলাপের পক্ষে যুক্তি হিসাবে বুদ্ধদেববাবুরা প্রায়ই বলেন, বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদেই তাঁরা পুরনো তাত্ত্বিক গোঁড়ামি ত্যাগ করে বাস্তববাদী পথে হাঁটছেন। একথা শুনলে রাজ্যের সাধারণ মানুষজনের মনে হবে, সত্যিই তো, রাজ্যের শিল্পোন্নয়ন ও বেকারদের চাকরির স্বার্থে বাস্তববাদী হওয়াই তো উচিত, এই বাস্তব প্রয়োজনটাই তো সবচেয়ে জরুরি ! তার জন্য প্রয়োজনে বিদেশি পুঁজির স্মরণ নিতে হলে নিতে হবে বৈ কী ! কিন্তু বিদেশি পুঁজির সাহায্যে সত্যিই শিল্পোন্নয়ন ও বেকারত্ব মোচন সম্ভব কিনা — তা তাঁরা ভেবে দেখেছেন কি ? বুদ্ধদেববাবুরা যে বিদেশি পুঁজির এত নামকীর্তন করছেন, তার আসল নাম সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি। তা, সেই সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি কি শোষণ-লুণ্ঠনের চরিত্র বদলে ফেলে এখন জনসেবার ব্রত নিয়েছে ? তা যদি নিত, তাহলে ইউরোপ ও আমেরিকার দেশে দেশে বেকারত্বের হাহাকার কেন ? দক্ষিণ কোরিয়া, থাইল্যাণ্ডের মতো যে দেশগুলি বিদেশি পুঁজির সাহায্যে শিল্পায়নের স্বপ্ন দেখিয়েছিল বিশ্ববাসীকে, সেই দেশগুলিতেও হাহাকার কেন ? কী এমন শিল্পোন্নয়ন সেখানে হয়েছে ? তার ভিত্তিতে কত কর্মসংস্থান হয়েছে ? আসলে, সবটাই ছিল লোকঠকানো শিল্পায়নের ফানুস মাত্র। বিনিয়োগকারীরা কয়েকটি ক্ষেত্রে তাদের পুঁজি খাটিয়ে মুনাফা তুলে নিয়ে চলে গেছে। রেখে গেছে সেই হাহাকার। আর এদেশের অভিজ্ঞতা কী ? ১৯৯১ সাল থেকে কংগ্রেস-বিজেপি — সবাই নয়া উদার অর্থনীতির সহায়তায় লগ্নি পুঁজি দিয়ে দেশে শিল্পায়নের অনেক ফানুস উড়িয়েছিল। কিন্তু গত ১৪-১৫ বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতায় মানুষ দেখেছে যে, তাদের সেই ফোলানো বেলুন চুপসে গিয়েছে। অন্ধ্রের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু — বুদ্ধদেববাবুর মতোই খুব গুণগান করে অন্ধ্রে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। দেশি-বিদেশি মালিক সাম্রাজ্যবাদীরা দলে দলে তাঁকে প্রশংসা করে 'দেশের সেরা মুখ্যমন্ত্রী'র শিরোপাও দিয়েছিল। বুদ্ধদেববাবুর সল্টলেকের ইন্‌ফোটেকের মতো চন্দ্রবাবুও হাইটেক মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে খ্যাত হয়েছিলেন। খোদ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ক্লিন্টন পর্যন্ত অন্ধ্রে গিয়ে চন্দ্রবাবুর প্রশংসা করে এসেছিলেন। সেই অন্ধ্রের উন্নয়নের হাল কী ? দেশের সবচেয়ে বেশি কৃষকের আত্মহত্যার রেকর্ড, আর বেকারিতে ছয়লাপ। এই যেখানে বাস্তব পরিস্থিতি, সেখানে বুদ্ধদেববাবুদের হাতে কী এমন যাদুদণ্ড আছে যে যার ছোঁয়ায়, কংগ্রেস, বিজেপি, চন্দ্রবাবু যা পারেনি, তাই তাঁরা করে দেখাবেন ? এ রাজ্যে জ্যোতি বসুর রাজত্বকাল থেকেই দেশি-বিদেশি পুঁজি ধরার জন্য নেতা-মন্ত্রী-আমলারা জনগণের ট্যাক্সের টাকায় দেশেবিদেশে খুব ছুটছেন, মাঝেমধ্যেই 'মউ' স্বাক্ষরিত হওয়ার সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। শিল্পে উৎসাহ দান প্রকল্পে অন্ততপক্ষে ৮৫৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গিয়েছে জনগণের ঘাড় ভেঙে আদায় করা ট্যাক্সের টাকা থেকে। এছাড়াও হাজার হাজার কোটি টাকা ট্যাক্স ছাড়ের ঘটনা তো আছেই। কী শিল্পায়ন হয়েছে এ রাজ্যে ? রাজ্যের ইঞ্জিনিয়ারিং ও বস্ত্রশিল্প তো আগেই উঠে গেছে। অনেক চটশিল্পও উঠে গেছে। আর যা আছে তা অধিকাংশ সময়ই বন্ধ থাকে ; অনাহারে থাকে শ্রমিকরা, কিন্তু মুনাফা লুটে নেয় মালিকরা। কোন বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলা, তার সহযোগী নানান শিল্প গড়ে তোলা — যার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে, মানুষ কাজ পাবে, শিল্পপণ্য বিক্রির বাজার বাড়বে — সেই উদ্দেশ্যে কোথায় বিনিয়োগ ? যতটুকু বিনিয়োগ নিয়ে ঢাকঢোল পেটানো হচ্ছে, সেটা ইন্‌ফোটেক ও সফ্‌টওয়ারে। সেখানে কত লোকের কর্মসংস্থান হচ্ছে ? এগুলি সবই পুঁজিনির্ভর শিল্প, যাতে খুব কম সংখ্যক লোকই কাজ পায়। এ যাবৎ সেখানে যত লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, প্রতিবছর তার ৪০ গুণ মানুষ কাজ হারাচ্ছে। বুদ্ধদেববাবুরা তাঁদের সরকারি ফাইল খুলে দেখুন, হিসেব পেয়ে যাবেন। ২০০১-০৩ — এই সময়ের মধ্যে এ রাজ্যে কাজ পেয়েছেন ২৫ হাজার ১৪৯ জন, অথচ এই সময়ে কাজ হারিয়েছেন ১০ লক্ষ ৬ হাজার ৮৬ জন (ন্যাশনাল লেবার সার্ভে, ২০০৩)। তাছাড়া আমাদের দেশে শিল্পবিকাশের চাহিদা মেটাবার জন্য এগুলো গড়ে উঠছে না। চুক্তির ভিত্তিতে বিদেশ থেকে আসা কাজগুলোই এরা করছে।

ফলে, শিল্পায়ন কিংবা কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির বাস্তব প্রয়োজনে তাঁরা পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বামপন্থী আন্দোলন বিসর্জন দিয়েছেন, কিংবা দেশি-বিদেশি পুঁজির সঙ্গে গলাগলি করছেন — এ এক চরম মিথ্যাচার। রাজ্যের বামপন্থী মানসিকতার জনগণকে প্রতারিত করতেই তাদের এই ধূর্ত কৌশল। আসলে সরকারি গদিতে টিকে থাকা এবং আরও আরাম-আয়েস ভোগের বাস্তব প্রয়োজনেই তাঁরা পুঁজির ভজনা করছেন। দেশি-বিদেশি পুঁজির মালিকদের তোয়াজ করে তাদের মুনাফা লুণ্ঠনের আরও সুযোগ করে দিলে তারাও বুদ্ধদেববাবুদের দিকে কৃপাদৃষ্টি দেবে। এদের মধ্যে এই-ই হচ্ছে লেনদেনের সম্পর্ক। এই হীন সম্পর্ককে আড়াল করতে শিল্পায়নের বাস্তব প্রয়োজনের ধাপ্পা দিচ্ছেন বুদ্ধদেববাবুরা। সেই সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষ বিশেষত ছাত্র-যুবকদের প্রতারিত করতে শিল্পায়নের ঢাকঢোল পিটিয়ে তাঁরা এমন একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করছেন যা থেকে মনে হবে, যেন বিরাট একটা ব্যাপার এ রাজ্যে ঘটতে চলেছে এবং কর্মসংস্থানের সমস্যা মেটাতে বুদ্ধদেববাবুরা কতই না তৎপর ! কিন্তু এই সবকিছুর শেষ ফল যে জনগণের জন্য অশ্বডিম্ব — বুদ্ধদেববাবুরা তা ভাল করেই জানেন।

বুদ্ধদেববাবু প্রায়ই বেশ দেমাকের সঙ্গে আজকাল বলেন, পুরনো তত্ত্বকে আঁকড়ে চলবে — বামপন্থীরা এত বোকা নয়। হ্যাঁ ঠিকই, যারা বুদ্ধদেববাবুদের মতো বামপন্থী তারা যে বোকা নয়, বরং বেশ চালাক, রাশিয়া ও চীনের ঝানু শোধনবাদীদের মতই চালাক — সেকথা সবাই স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁদের সবচেয়ে বড় বোকামি হল, তাঁরা জনগণকে বড্ড বেশি বোকা ভাবেন। দেশি-বিদেশি পুঁজিপতি-ব্যবসাদার, গ্রামীণ জোতদার, ঠিকেদার, কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে তাঁরা অহর্নিশি গলাগলি করবেন, পাঁচতারা, সাততারা হোটেলে ভোজ সারবেন, শ্রমিক তথা গণআন্দোলনকে পুলিশ দিয়ে পিটিয়ে মারবেন, আর এগুলিকেই 'বাস্তব প্রয়োজন' বলে জনগণকে বুঝিয়ে যাবেন এবং জনগণও পুতুলের মতো চিরকাল তাই-ই বুঝে চলবেন — এমনটাই বুদ্ধদেববাবুদের ধারণা। তবে, জনগণকে এতটা বোকা না ভাবলেই তাঁর ভাল করতেন। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে তাঁরা ভুলে গেছেন যে, কিছু লোককে কিছুদিনের জন্য বোকা বানানো যায়, কিন্তু সমস্ত লোককে চিরদিনের জন্য বোকা বানানো যায় না।

নিরাপত্তারক্ষীর গুলিতে ছাত্রী নিহত , মেছেদা-কোলাঘাট বন্‌ধ

২৯শে জানুয়ারি শনিবার কোলাঘাট তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভিতরে নিরাপত্তা রক্ষীর গুলিতে নবম শ্রেণীর এক ছাত্রীর হত্যা এবং আরও তিনজন গ্রামবাসীর গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনার প্রতিবাদে রবিবার (৩০শে জানুয়ারি) এস ইউ সি আই-এর ডাকে মেছেদা শহর বন্‌ধ ছিল সর্বাত্মক। সিটু এই বন্‌ধকে ভাঙার জন্য দোকানদার, ব্যবসায়ীদের হুমকি দিলেও তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বন্‌ধে সাড়া দেন। বন্‌ধের দিন সকালে এস ইউ সি আই-এর পক্ষ থেকে এক বিশাল মিছিল বের হয়। পুলিশ এই মিছিলকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। সোমবার ৩১শে জানুয়ারি এই ঘটনার প্রতিবাদে এস ইউ সি আই-এর ডাকে সমগ্র থার্মাল এলাকায় সাধারণ মানুষ ১২ ঘন্টা বন্‌ধ পালন করেন। পরিবহন ব্যবস্থাকে বন্‌ধের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল। ছাত্রীহত্যার প্রতিবাদে ডি এস ও ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। ঐ দিন থার্মাল এলাকার সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এস ইউ সি আই সারা পূর্ব মেদিনীপুর জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস ও জেলা শাসকের দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এস ইউ সি আই-এর পূর্ব মেদিনীপুর জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা বলেছেন, ঘাস কাটতে আসা গরিব মহিলাদের উপর নিরাপত্তারক্ষীরা বিনা প্ররোচনায় গুলি চালিয়েছে। তিনি বলেন, এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র গড়তে গিয়ে সরকার এলাকার বহু মানুষের জমি, বাস্তুভিটা কেড়ে নিয়েছে। বিনিময়ে পরিবার পিছু একজনকে চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি আজও পালন করেনি। রাস্তাঘাট ও জলনিকাশির ব্যবস্থা বন্ধ হওয়ার ফলে প্রতি বছর তেল-জল-ছাইয়ের স্রোতে গ্রামগুলি ডুবে গেলেও সরকার উদাসীন। ধোঁয়া ও ছাইয়ের বিষাক্ত দূষণে শিশু, বৃদ্ধ সহ বহু মানুষ রোগাক্রান্ত। ভিটেমাটি হারানো এই মানুষেরা কেউ রিক্সা টেনে, জনমজুর খেটে, কেউবা গরুর দুধ বিক্রি করে সংসার চালানোর চেষ্টা করেন। তাই গরুর জন্য ঘাস কাটতে প্রতিদিনের মতো ভেতরে গিয়েছিল মেয়েরা। নিরাপত্তারক্ষীরা গুলি চালিয়ে হত্যা করল এক ছাত্রীকে এবং গুলিবিদ্ধ করল আরও তিনজনকে। এই ঘটনার প্রতিবাদে গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে গ্রামবাসীদের বিক্ষোভে পুলিশ লাঠি চালায় ও ৭ জনকে গ্রেপ্তার করে। এস ইউ সি আই পূর্ব মেদিনীপুর জেলা কমিটি দাবি জানিয়েছে ঃ (১) ধৃত ব্যক্তিদের অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হবে, (২) নিহত ও আহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, (৩) এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে এক মাসের মধ্যে সত্য উদ্‌ঘাটিত করতে হবে, (৪) দোষী পুলিশদের সাসপেন্ড করে তদন্তের রিপোর্ট অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে, (৫) জমিচ্যুত ও বাস্তুচ্যুত প্রতি পরিবারের একজনকে চাকরি দিতে হবে, (৬) পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হবে।

পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদই সংকটকে তীব্র করেছে

মৃত্যু ও ধ্বংসের এই ভয়াবহতা নিছক প্রাকৃতিক কারণে নয়

ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জনগণের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছে, তার প্রচণ্ডতা ও ভয়াবহতাকে ঠিক ঠিকভাবে উপলব্ধি করা একমাত্র সম্ভব আধুনিক যুগের মূল দ্বন্দ্বের নিরিখেই। যে দ্বন্দ্ব হল — একদিকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির বিস্ময়কর অগ্রগতির ফলে সৃষ্ট সমাজের বিপুল উৎপাদিকা শক্তি, অন্যদিকে পুঁজিবাদী শোষণভিত্তিক পুরনো সমাজব্যবস্থা, যার ভূমিকা ইতিহাসে নিঃশেষিত হয়ে গেছে — এই দুয়ের মধ্যেকার বিরোধাত্মক দ্বন্দ্ব। মানবজাতি যুগ যুগ ধরে যেসব সমস্যার দুর্বিষহ বোঝা বহন করে আসছে, তার অনেক কিছুই লাঘব করার, এমনকী নির্মূল করার ক্ষমতাও আধুনিক প্রযুক্তির রয়েছে, কিন্তু সেই আধুনিক প্রযুক্তির মালিকানা রয়েছে পুঁজিপতিশ্রেণীর হাতে, যারা তা কাজে লাগাচ্ছে মুনাফার জন্য এবং তার ফলাফল হচ্ছে, মানবজাতির ক্রমবর্ধমান দুর্দশা।

একথা ঠিক যে, সমুদ্রের নিচের ভূমিকম্প ও তার ফলে প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসকে কোনরকম প্রযুক্তি দিয়েই আটকানো যেত না। কিন্তু অগ্রগতির পথে মানবসমাজ এমন স্তরে পৌঁছেছে, যেখানে সামাজিক সংগঠন ও প্রযুক্তির সম্মিলনে বিপর্যয়ের ভয়াবহতাকে বহুলাংশে কমানো যেত। এ ধরনের দুর্যোগে বিপন্ন মানুষদের উদ্ধারের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা, ট্রেনিং ও প্রস্তুতি যদি থাকত, সময় থাকতে সতর্ক করার ব্যবস্থা যদি রাখা হত, ঘটনার পরপরই জনগণের মধ্য থেকে ব্যাপক সংখ্যায় স্বেচ্ছাসেবক সংগঠিত করে দ্রুত উদ্ধারের কাজে তাদের লাগানোর পরিকল্পনা যদি থাকত, তবে হাজার হাজার মানুষের জীবন নিশ্চয়ই বহুলাংশে রক্ষা করা সম্ভব হত।

এ'ধরনের প্রাক্ প্রস্তুতি ও প্রয়োজনীয় কাজগুলি একমাত্র সেই ধরনের সরকারই করতে পারে, যারা জনস্বার্থ ও জনকল্যাণকে প্রাথমিক কর্তব্য বলে মনে করে। কিউবা হচ্ছে এমন একটি দেশ। কিউবা গরিব দেশ। একদিকে দীর্ঘ মার্কিন অবরোধ, অন্যদিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির পতনের ফলে কিউবার অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। তা সত্ত্বেও ভয়ঙ্কর সামুদ্রিক ঝড় ও নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কিউবার কৃতিত্বের কথা আন্তর্জাতিকভাবেই স্বীকৃত।

২০০৪ সালের সেপ্টেম্বরে ক্যারিবিয়ান উপকূলে আছড়ে পড়েছিল সামুদ্রিক ঝড়। এত প্রচণ্ড ঝড় ইতিপূর্বে মাত্র ৪বার হয়েছিল। বাতাসের গতিবেগ হয়েছিল ঘণ্টায় ১২৪ মাইল। কিউবা ২০ লক্ষ মানুষ, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নিয়েছিল। প্রথম তিন ঘণ্টায়ই ১ লক্ষ মানুষকে তারা সরাতে সক্ষম হয়েছিল। এদের মধ্যে ৭৮ শতাংশ মানুষকে জনগণই তাদের ঘরে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিল, শিশুদের রাখা হয়েছিল বোর্ডিংয়ে, এমনকী পশুপাখীদের পর্যন্ত স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। একজন মানুষও মারা যায়নি।

রেড ক্রস, রেড ক্রেসেন্ট সোসাইটি, রাষ্ট্রসংঘ ও এমন আরও সব পুঁজিবাদী সমাজে অবস্থিত সংস্থা, যারা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপর্যয়কর ফলাফলকে কমাবার নানা উপায় নিয়ে ভাবনা চিন্তা করে, তারা সকলেই এ ব্যাপারে কিউবা সরকারের ভূমিকাকে পর্যবেক্ষণ করতে ও প্রশংসা করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু একথা স্বীকার করার সাহস কারোরই হয়নি যে কিউবা সমাজতান্ত্রিক দেশ বলেই একাজ করতে পেরেছে। অক্সফ্যামের মতো পুঁজিবাদী চিন্তার অনুগামী একটি সংস্থার 'কিউবার অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা' শীর্ষক রিপোর্টে কিউবার সিভিল ডিফেন্স বাহিনী, প্রাক হুঁশিয়ারি ব্যবস্থা, উপযুক্ত সাজ-সরঞ্জামযুক্ত উদ্ধারকারী দল, মজুত খাদ্য ভাণ্ডার ও অন্যান্য সহায়সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এরপর ঐ রিপোর্টে লক্ষণীয়ভাবে বলা হয়েছে, এই ধরনের সহায়সম্পদ নিশ্চয়ই উল্লেখযোগ্য, কিন্তু শুধু এই ধরনের সহায়সম্পদ থাকলেই যদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপন্ন মানুষকে রক্ষা করা সম্ভব হত, তাহলে আমেরিকায় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মৃত্যুর সংখ্যা অনেক কম হত। ফ্লোরিডার সামুদ্রিক ঝড়ে মার্কিন সরকার ১৩০০ কোটি ডলার খরচ করেছিল, কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা ছিল কিউবার চেয়ে বেশি। সুতরাং, ঐসব সহায়সম্পদের বাইরে অন্য কী কী গুণাবলী থাকার জন্য কিউবার ব্যবস্থাটা এত ভাল হতে পারল, সেটাও সমান গুরুত্ব দিয়ে জানা দরকার। দেশের গোটা জনসম্প্রদায়কে সামাজিক কর্মকাণ্ডে সমবেত করতে পারার ক্ষমতা, জনসংহতি, মানবজীবন রক্ষায় সরকারের পরিষ্কার রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা এবং এধরনের বিপর্যয় সম্পর্কে জনসচেতনতা, ঘটনার সময় কী কী করতে হবে, সে বিষয়ে জনসাধারণের জ্ঞান —এগুলি কিউবার আছে।

কিউবার সাফল্যের মূলে রয়েছে দেশের শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থের সঙ্গে সরকারের একাত্মতা এবং শ্রমজীবী জনগণের মধ্যে এই সরকার সম্পর্কে গভীর আস্থা। বিপরীতে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের জনগণের ভাগ্য সঁপে দেওয়া হয়েছে সাম্রাজ্যবাদীদের ও নিজ নিজ দেশের পুঁজিবাদী সরকারগুলির হাতে। এর ফলেই মানুষের মৃত্যু এত বিরাট সংখ্যায় ঘটে গেল যা অনিবার্য ছিল না।

পেন্টাগন কী মানবিক ? ইরাকিদের জিজ্ঞাসা করুন

বর্তমান শ্রেণীসম্পর্কের কাঠামোর ভিত্তিতে এই বিপর্যয়ের বিচার-বিশ্লেষণ করাটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে উদ্ভুত সংকটের প্রধান দিকটি হচ্ছে, এই বিপর্যয় ঘটেছে ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর অঞ্চলে সাত কোটিরও বেশি নিপীড়িত মানুষ অধ্যুষিত সেইসব দেশে, যেখানে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যের পাশাপাশি রয়েছে এইসব দেশের নিজস্ব পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ।

বুশ সরকার যেভাবে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার সাহায্যের প্রতিশ্রুতির পরিমাণকে বাড়িয়ে ৩৫ কোটি ডলার করার ঘটনাকে বিরাট প্রচারের বিষয় করেছে, তা সত্যই লজ্জাজনক। একই কথা ইউরোপীয় ও জাপানি সাম্রাজ্যবাদীদের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। এদের সমগ্র প্রতিশ্রুত অর্থের পরিমাণ হবে মাত্র কয়েক শত কোটি ডলার।

এইসব সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি শত শত বছরের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের মধ্য দিয়ে, সস্তা শ্রমশক্তি ও কাঁচামাল লুট করে যে বিপুল মুনাফা এই অঞ্চল থেকে পাচার করেছে, তার তুলনায় প্রতিশ্রুত সাহায্যের পরিমাণ কোন হিসাবেই পড়ে না। ঔপনিবেশিক শাসনশোষণ ও পরবর্তীকালে পুঁজিবাদী শাসন-শোষণ এইসব অঞ্চলের মানুষদের গরিবির অতল গহ্বরে ফেলে রেখেছে বলেই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে জনগণের দুর্দশা এত ভয়ানক হয়ে দাঁড়াল।

সবচেয়ে জঘন্য ব্যাপার হল, এই বিপর্যয়ে সাহায্য দেবার নাম করে মার্কিন প্রশাসন এবং তার গোয়েন্দা বিভাগ পেন্টাগন, বিধ্বস্ত এলাকাগুলিতে মিলিটারি পাঠাচ্ছে। মানবিকতার নামে এরা ইন্দোনেশিয়ার আচেতেএবং শ্রীলঙ্কায় হেলিকপ্টার থেকে ত্রাণসামগ্রী ফেলছে, আবার এরাই ইরাকে ১ লাখ নিরীহ সাধারণ মানুষকে হত্যা করেছে।

সুনামির আক্রমণ কি অপ্রত্যাশিত ছিল

সুনামি অসংখ্য মানুষের প্রাণ কেড়ে নিল। অথচ সুনামির পূর্বাভাস দেওয়ার ব্যবস্থা বহুদিন আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে। ১৯৬৫ সাল থেকে প্রশান্ত মহাসাগরে সুনামির পূর্বাভাস জানাবার যন্ত্র কাজ করছে। পরবর্তীকালে ১৯৯৫-তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই যন্ত্রকে আরও উন্নত, আরও সূক্ষ্ম করেছে। ২০০১ সাল নাগাদ এই যন্ত্রগুলিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো হয়, তবে মূলত এগুলি রাখা হয়েছিল মার্কিন এবং জাপানি সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যাধীন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। সুনামির পূর্বাভাস জানাবার এই যন্ত্র (ডিপ ওশান অ্যাসেসমেন্ট অ্যাণ্ড রিপোর্টিং অফ সুনামিস, সংক্ষেপে ডি এ আর টি) এত সূক্ষ্ম যে, সমুদ্রের তলায় ভূত্বকে মাত্র এক সেন্টিমিটার জায়গার কোনরকম পরিবর্তন হলেও তা ধরতে পারে। যন্ত্রটি এই পরিবর্তনের খবর সমুদ্রে বিশেষ ধরনের এক ভাসমান বয়াতে পাঠিয়ে দেয় ; সেখান থেকে সেই বার্তা উপগ্রহের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কয়েক মিনিটের মধ্যেই এই জটিল ক্রিয়াটি ঘটে যায়। শুধু ভূমিকম্প নয়, এর ফলে যে সুনামি সৃষ্টি হতে চলেছে, তার চেহারা কেমন হবে, এই যন্ত্রটি সে কথাও জানাতে পারে।

ভারত মহাসাগরে সুনামি সৃষ্টি হওয়ার ঘটনা নেহাতই অপ্রত্যাশিত বলে পুঁজিবাদী প্রচারমাধ্যম অনবরত যে প্রচার করে যাচ্ছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'ন্যাশনাল ওশানোগ্রাফিক অ্যাণ্ড অ্যাটমস্ফেরিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন' বা 'এন ও এ এ' সংস্থার বিজ্ঞানীরা ২০০৩ সালের মার্চ মাসে একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। সেখানে তাঁরা গত ৪ বছরে ঘটে যাওয়া ৮টি সুনামির ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এগুলির মধ্যে ৩টি ঘটেছিল ইন্দোনেশিয়ায় এবং চতুর্থটি, যেটি ১৯৯৪ সালের 'জাভা সুনামি' নামে খ্যাত, সেটি জাভা এবং বালিদ্বীপের দক্ষিণ উপকূলে আঘাত করেছিল। ঐ সুনামির কবলে পড়ে ৩০০-র মতো মানুষ মারা যায় এবং বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়। সুতরাং ভারত মহাসাগরে সুনামি নেহাৎ একটা আচমকা ঘটে যাওয়া বিপর্যয় — এ'কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

শোষণমূলক রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের প্রাণের মূল্য দেয় না

সুনামির সঙ্কেতজ্ঞাপক যন্ত্রগুলির একেকটির দাম ২ লক্ষ ৫০ হাজার মার্কিন ডলার। যে শত সহস্র মানুষ সুনামির আঘাতে জীবন দিলেন, তাঁদের অমূল্য প্রাণের তুলনায় এই অর্থ কিছুই নয়। কিন্তু ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ভারতবর্ষ, থাইল্যাণ্ড সহ সুনামিবিধ্বস্ত সমস্ত অঞ্চলগুলির সরকার এই যন্ত্র বসানোর মতো সামান্য কাজটুকুও করেনি। এ থেকেই এইসব সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী সরকার-গুলির মনোভাবের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

এখন এই ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার পরে চলছে পারস্পরিক দোষারোপের পালা। সুনামির সতর্কবার্তা জানানোর জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা না থাকার বিষয়টি নিয়ে এখন নানাবিধ আলোচনা চলছে। ভারত মহাসাগরে সুনামির সংকেতবার্তা জ্ঞাপক যন্ত্র স্থাপন করার বিষয়ে বিপর্যস্ত এলাকার সরকারগুলি এখন আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছে।

তবে শুধু যন্ত্র বসিয়ে আগাম সতর্কবার্তা জারি করে সুনামি সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করা যাবে না; যদি না গ্রামগুলিকে ভিত্তি করে সাধারণ মানুষের মধ্যে পূর্বপরিকল্পিতভাবে গণউদ্যোগ সৃষ্টি করা যায়। পুঁজিবাদী দেশগুলোতে এই ধরনের কাজ মূলত চাপানো হয় পুলিশ কিংবা রাষ্ট্রের অন্যান্য দমনমূলক সংস্থার ওপর।

বিপর্যয়ের সামনে পড়ে সুনামি-বিধ্বস্ত অঞ্চলের সমস্ত পুঁজিবাদী সরকার এবং সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর অর্থসাহায্যে পুষ্ট সেবামূলক সংস্থাগুলি যে আনাড়িপনা দেখাচ্ছে, তার মূল রয়েছে অনেক গভীরে; সুনামির পূর্বাভাস দেওয়ার যন্ত্র এই সমস্যার একমাত্র সমাধান নয়। থাইল্যাণ্ডের একটি সংবাদপত্রে ('দি নেশন', ৩১ ডিসেম্বর, ০৪ সংখ্যা) একটি অদ্ভুত খবর ফাঁস হয়ে গেছে। কাগজটির রিপোর্ট অনুযায়ী, ভূমিকম্প সংক্রান্ত বিষয়ের দায়িত্বে থাকা চারজন অফিসারের মধ্যে একজন জানিয়েছেন যে, ভূমিকম্প শুরু হওয়ার কয়েক মিনিটের মধ্যেই আবহাওয়া দপ্তর তা জানতে পেরে গিয়েছিল। অফিসাররা সুনামির আশঙ্কা করে বিপর্যয়ের চেহারা কেমন হবে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও করেছিলেন; কিন্তু সেদেশের পর্যটন দপ্তরের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে ঐ অফিসাররা খবরটি চেপে রেখেছিলেন। বেড়ানোর এই মরশুমে যখন সমস্ত হোটেলগুলি পর্যটকে পূর্ণ হয়ে রয়েছে, সেই অবস্থায় আবহাওয়া দপ্তর 'সুনামি আসতে পারে' বলে সতর্কবার্তা ছড়িয়ে দেবার পর ঘটনাচক্রে যদি সুনামি না হয়, তাহলে পর্যটন ব্যবসা প্রচণ্ড মার খাবে — এই ছিল অফিসারদের আশঙ্কা।

এই ঘটনার সঙ্গে একবার কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল কাস্ত্রোর একটি বক্তব্যের তুলনা করুন। কিউবায় বিপর্যয় মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের উদ্যোগ নিয়ে লেখা একটি রিপোর্টে প্রেসিডেন্ট কাস্ত্রো বলেছেন, ''বিপর্যয়ের ফলে যত ক্ষতিই হোক না কেন, আমরা ঠিক সামলে নেবো। আমাদের কাছে বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে জয়লাভের অর্থ, ন্যূনতম সংখ্যক মানুষের প্রাণহানি।''

হনুলুলুর 'সুনামি সেন্টার'-এর বিজ্ঞানীরা জানতেনই না ভারত মহাসাগর সংলগ্ন দেশগুলিতে প্রশাসনিক কর্তাদের কার কাছে সতর্কবার্তা পাঠানো উচিত; তাঁদের কাছে এঁদের কোন টেলিফোন নম্বরই ছিল না। বিপর্যয় আছড়ে পড়ার পরেও ভারতবর্ষ, কলম্বো কিম্বা ব্যাঙ্ককের সুনামিবিধ্বস্ত মানুষগুলিকে ত্রাণ ও অন্যান্য সাহায্যের জন্য বেশ কিছুদিন অপেক্ষা করতে হয়েছে; এদেশগুলির সরকার কোন তৎপরতার পরিচয় দিতে পারেনি। অথচ এই ভারতবর্ষই নাকি পরমাণু শক্তিধর দেশ!

এই যদি সরকারগুলির হাল হয়, তাহলে সুনামির বিপদসঙ্কেত জানানোর জন্য 'আর্লি ওয়ার্নিং সিস্টেম' বাস্তবিকপক্ষে কোন কাজেই আসবে না। ইন্দোনেশিয়ার সরকারি কর্তৃপক্ষ জাপানি ও মার্কিন বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে গত '৯২, '৯৪ এবং '৯৬ সালে সেখানকার সুনামিবিধ্বস্ত এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন। এছাড়া সম্প্রতি তিনটি সুনামি ইন্দোনেশিয়ায় আঘাত করায় সেদেশের সরকারের এই বিপর্যয় সম্পর্কে যথেষ্ট পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। শুধু তাই নয়, এবারের সুনামি তীরে আছড়ে পড়ার আগেই ইন্দোনেশিয়া এবং থাইল্যাণ্ডের সরকার সতর্কবার্তা পেয়ে গিয়েছিল। এত কিছু সত্ত্বেও উপকূলবর্তী হাজার হাজার মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্য, কিংবা বিপর্যয়-বিধ্বস্ত মানুষদের ত্রাণের জন্য বলতে গেলে কিছুই করা হয়নি। ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত সম্পদ খরচ হয়ে গেছে দুর্নীতিগ্রস্ত মিলিটারি, স্থানীয় পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদী তেল কোম্পানিগুলির মতো শোষণকারীদের সেবায়।

এবারের সুনামি সাধারণ মানুষের জীবনে যে ভয়ঙ্কর বিপর্যয় নামিয়ে এনেছে, তা থেকে তাদের উদ্ধার করতে বিধ্বস্ত এলাকার সমস্ত সরকারগুলির একযোগে যৌথ উদ্যোগের ভিত্তিতে কাজে নামা দরকার ছিল। কিন্তু এগুলি তো নিছক সরকার নয়, এরা হল শোষণমূলক রাষ্ট্র — শ্রেণীপীড়নের যন্ত্রবিশেষ। এদের পুলিশ, এদের মিলিটারি, এদের পৌরপ্রশাসন, আমলাতন্ত্র সবই বছরে ৩৬৫ দিনই শোষকশ্রেণীর হয়ে কাজ করে, সাধারণ মানুষের স্বার্থের সঙ্গে এদের চিরন্তন বিরোধ। কোন

সাতের পাতায় দেখুন

দীর্ঘপথে মানুষের উষ্ণ অভিনন্দনে সমৃদ্ধ মহামিছিল

একের পাতার পর

স্কুলে-কলেজে, এমনকী বাসে-ট্রেনেও কর্মীরা স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে থাকেন। দল-মত নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ মানুষ স্বাক্ষর দিয়েছেন শুধু নয়, বহু মানুষ উদ্যোগ নিয়ে ফর্ম চেয়ে নিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে দিয়েছেন। মিছিলে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে রাজ্য জুড়ে যেমন অসংখ্য দেওয়াল লিখন হয়েছিল, তেমনই রাজ্যের সর্বত্র শত শত পথসভার মধ্য দিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতিগুলি তুলে ধরার পাশাপাশি দাবিগুলিও তুলে ধরা হয়েছিল। সর্বত্রই দাবিগুলির প্রতি মানুষের প্রবল সমর্থন লক্ষ্য করা যাচ্ছিল। ধীরে ধীরে মানুষের মনে মহামিছিলের পক্ষে একটা মানসিক প্রস্তুতি গড়ে উঠেছিল। এই দীর্ঘ প্রস্তুতিরই প্রতিফলন ঘটেছে মহামিছিলে। রাজ্যের প্রতিটি জেলা থেকে লক্ষাধিক মানুষ — শ্রমিক কৃষক, হকার, মজুর, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, গরিব, ছাত্র, যুব, মহিলা, বৃদ্ধ সকলে এসেছেন। এসেছেন অন্যদলের সমর্থকও, এমনকী কিছুদিন আগেও যাঁরা ভিন্ন দলের হয়ে কাজ করেছেন তাঁরাও। আগে থেকেই বিভিন্ন জেলা থেকে ও মহানগরীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অসংখ্য মিছিল আসতে শুরু করে উত্তর কলকাতার দেশবন্ধু পার্কের জমায়েতে। বেলা ১২টার মধ্যেই পার্কের একাংশ, সম্মুখের রাস্তা ভরে যায় মানুষে মানুষে।

বেলা ১টায় শুরু হয়ে যায় মিছিল শুরুর প্রস্তুতি। মাইকে বার বার ঘোষণা করা হচ্ছে ক্রমানুসারে জেলাগুলির অবস্থান। মিছিল সাজানোর দায়িত্ব নিয়েছিলেন যুব স্বেচ্ছাসেবকেরা। এই স্বেচ্ছাসেবকদের ওপরই দায়িত্ব ছিল বৃদ্ধ, মহিলা, ছাত্র সহ এই সুবিশাল মিছিলকে সুশৃঙ্খলভাবে গন্তব্যস্থানে পৌঁছে দেওয়ার। তাই মিছিল শুরুর আগেই ভাগে ভাগে স্বেচ্ছাসেবকরা পৌঁছে যান রাস্তার গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে।

মিছিল সাজানো শুরু হতেই বোঝা গেল, এই সুবিশাল জনতাকে একটি সুসংবদ্ধ মিছিলের আকারে সাজাতে পার্কের সম্মুখের এই প্রশস্ত রাস্তাও যথেষ্ট নয়। বেলা দেড়টায় বিশাল মিছিল শুরু হল রাজভবনের উদ্দেশে। মিছিল এগিয়ে চললো বেলগাছিয়া রোড হয়ে শ্যামবাজারের দিকে — পৌঁছাল পাঁচমাথার মোড়ে । তখনও পার্কের সামনে একের পর এক জেলার মিছিল সাজানো চলছে।

মিছিলের সম্মুখ সারিতে হাঁটছিলেন কমরেড প্রভাস ঘোষ, কমরেড অসিত ভট্টাচার্য, কমরেড রণজিৎ ধর, কমরেড মানিক মুখার্জী, কমরেড প্রতিভা মুখার্জী, কমরেড ছায়া মুখার্জী প্রমুখ দলের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। পিছনে মহামিছিলের মূল ব্যানার সহ ১৯ দফা দাবি সম্বলিত অসংখ্য সুদৃশ্য প্ল্যাকার্ড নিয়ে এগিয়ে চলেছিল কয়েক হাজার যুবক-যুবতীর এক বিরাট প্রবাহ। তার ঠিক পরেই হাঁটছিলেন পার্টির রাজ্য নেতৃবৃন্দ — কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার, কমরেড শঙ্কর রায়চৌধুরী, কমরেড সলিল চক্রবর্তী, কমরেড শঙ্কর সাহা, কমরেড ভাস্কর গুপ্ত, কমরেড বিধান চ্যাটার্জী, কমরেড সৌমেন বসু, কমরেড সদানন্দ বাগল, কমরেড সুজিত ভট্টশালী, কমরেড দীপঙ্কর রায় প্রমুখ। তারপরেই ছিল প্রায় দুই কোটি স্বাক্ষর সম্বলিত স্বাক্ষরপত্র বহনকারী একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো। পিছনে আট সারিতে পুরো রাস্তা জুড়ে হাঁটছিলেন মিছিলে অংশগ্রহণকারী মহিলারা। তারপরে ছয় সারি, তারপরে একেবারে শেষ মানুষটি পর্যন্ত মিছিল এগিয়েছে চার সারিতে। বিশাল পাঁচমাথার মোড় অতিক্রম করে মিছিল ঢুকল বিধান সরণীতে। জনতরঙ্গের মতো বিধান সরণীর দু'পাশ ছাপিয়ে এগিয়ে চলল মিছিল। এ তরঙ্গে বিশৃঙ্খলা ছিল না, ছিল ছন্দোবদ্ধ তরঙ্গ। গভীর জলরাশির এক প্রচণ্ড স্রোতের মতোই তা এগিয়ে চলেছিল। তুলনায় চওড়া বিধান সরণীকে যেন সংকীর্ণ মনে হচ্ছিল। দেখা গেল, মিছিল দেখতে পথচারী মানুষ রাস্তার দু'পাশে ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেছেন। দোকান থেকে বেরিয়ে এসেছেন দোকানদার, কর্মচারী ; পুরো মিছিলটাই দেখবেন বলে কেউ কেউ টুল নিয়ে, চেয়ার নিয়ে ফুটপাথে এসে বসেছেন। বাড়ির ছাদে, বারান্দার ভিড় করেছেন মানুষ — এ মিছিল দেখতে পারার মধ্যেই যেন তাঁদের গভীর তৃপ্তি ও আনন্দ। পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজী মূর্তির পাদদেশে এলাকার মানুষদের নিয়ে একটি স্লোগান স্কোয়াডের আয়োজন করেছিলেন পার্টির স্থানীয় কর্মীরা। মাইকে ধ্বনিত হচ্ছিল মহামিছিলের দাবিগুলি, গলা মেলাচ্ছিলেন মিছিলের মানুষ। সমোচ্চারিত স্লোগানের অনুরণন উপস্থিত হাজার হাজার জনতার মধ্যে পৌঁছে অদ্ভুত এক অনুভূতির সৃষ্টি করছিল। মিছিলের স্লোগানও যে এমন করে আন্দোলনের বার্তা মানুষের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারে, আন্দোলনকারীদের সংস্কৃতির পরিচায়ক হয়ে উঠতে পারে, উপস্থিত মানুষের বক্তব্যেই তার প্রমাণ মিলল। একজন পথচারী বললেন, ''স্লোগান দেখেই বোঝা যায় এঁরা কতখানি 'ডেডিকেটেড', কতখানি 'সিরিয়াস' ''। সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, ''বিপ্লবীদের মিছিল, মিছিলের স্লোগান, তার কায়দা — সবকিছুর মধ্যেই যদি একটা উচ্চ সংস্কৃতি প্রতিফলিত না হয়, তবে তা কখনই সাধারণ মানুষকে আকর্ষণ করতে পারবে না।' অদ্ভুত এক আন্তরিকতায় দু'পাশের মানুষ তাকিয়ে ছিলেন মিছিলের দিকে। মিছিলের স্লোগানে তাঁদের অন্তরের দাবিই যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে, তাঁদের অন্তরের সমস্ত ক্ষোভ, জ্বালা মিছিলকারীদের ঐ উজ্জ্বল মুখের মধ্যে মুক্তির আলো দেখতে পেয়েছে। শত শোষণ, অত্যাচারেও মানুষের বাঁচার আকাঙ্ক্ষাকে কেউ হত্যা করতে পারে না। তাই বারবার প্রতারিত মানুষ এই মিছিলেই আবারও তাঁদের বাঁচার দিশা খুঁজেছে।

এক যুবক আর একজনকে ডেকে দেখাচ্ছেন, ''দ্যাখ, ঐ যাচ্ছে ট্যাবলোভর্তি স্বাক্ষরপত্র —ওতে আমারও স্বাক্ষর আছে।'' এমনই হাজার হাজার মানুষ দু'পাশে দাঁড়িয়েছিলেন যাঁরা স্বাক্ষর দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন, মন থেকে মিছিলেরই শরিক হয়েছেন। তাই তো দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেও প্রায় কেউই মিছিল ভেঙে এগিয়ে যেতে তৎপর হননি, যদিও স্বেচ্ছাসেবকরা তৎপর ছিলেন যাঁরা পার হতে চেয়েছেন, তাঁদের পার করে দিতে। বিকলাঙ্গ মানুষ, অসুস্থ মানুষ, বয়স্ক মানুষের হাত ধরে পার করে দিয়েছেন তাঁরা, মাথায় বোঝা নিয়ে কাউকে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়নি। আসলে মানুষই চেয়েছেন মিছিলকে বাধাহীনভাবে পার করে দিতে, কারণ এ মিছিল যে তাঁদেরই বহু আকাঙ্খিত শোষণমুক্তির সংগ্রামের দিশারী।

মিছিলের মাঝে মাঝে সুসজ্জিত, সুদৃশ্য ট্যাবলোগুলির গায়ে স্পষ্টলিখিত দাবিগুলি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েছেন পথের ধারে দাঁড়ানো মানুষ। দলের কর্মীরা তৈরি করেছেন এই ট্যাবলোগুলি। বামফ্রন্টের শিল্পায়নের নজির হিসাবে একটি ট্যাবলোতে উল্লেখ ছিল, গত দশ বছরে রাজ্যে কাজ হারিয়েছেন ১২ লক্ষ মানুষ, আর কাজ পেয়েছেন মাত্র ৪৩ হাজার। তা দেখে মানুষ ধিক্কার জানিয়েছেন উন্নয়নের নামে এই ভাঁওতাকে।

আজ যখন মালিকশ্রেণীর সেবাদাস শাসকদলগুলি মালিকদের স্বার্থকেই দেশের স্বার্থ হিসাবে দেখাতে চাইছে, মুষ্টিমেয় মালিকশ্রেণীর উন্নয়নকেই দেশের সমস্ত মানুষের উন্নয়ন বলে বোঝাতে চাইছে, সমস্ত শোষণ-নিপীড়ন, অত্যাচারকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে শেখাচ্ছে এবং একেই যুগের হাওয়া বলে বোঝাতে চাইছে, তখন এই মহামিছিল যেন তার বিরুদ্ধে একটি মোক্ষম জবাব হিসাবে, প্রতিবাদের প্রতীক হিসাবে সাধারণ মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তাই শোষিত মানুষ দূরদূরান্ত থেকে ছুটে এসেছেন এই মহামিছিলে। অনেকেই বেরিয়েছেন আগের দিন সকালে, দুপুরে, বিকেলে। দীর্ঘপথ পায়ে হেঁটে এসে ট্রেন ধরেছেন। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে যাত্রাপথের ধকল সহ্য করে মিছিলে যোগ দিয়েছেন। কোন ক্লান্তিই মিছিলে হাঁটা থেকে তাঁদের বিরত করতে পারেনি। মিছিলে হাঁটছিলেন মেদিনীপুরের মুগবেড়িয়া থেকে আসা ৭২ বছরের এক বৃদ্ধা। মিছিলে এই দীর্ঘপথ হাঁটতে কেন তিনি এতদূর থেকে এসেছেন জিজ্ঞাসা করায় পিছনে হাঁটতে থাকা যুবক উত্তর দেন, ঠাকুমাকে অনেক অনুনয়-বিনয় করেছিলাম মিছিলে না হাঁটার জন্য। কিন্তু কোনভাবেই তাঁকে নিরস্ত করতে পারিনি। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। মনে পড়ে গেল ঐ জেলারই মাতঙ্গিনী হাজরার কথা। শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। এই বিরাট জনসমুদ্র, এতো শুধু আদর্শের, আন্দোলনের টানেই উপস্থিত হয়েছে ! ঐ যে শিশুকোলে মা হেঁটে চলেছেন, বা, যে-বৃদ্ধ কৃষক পা টেনে টেনে সমান তালে এগিয়ে চলেছেন, সেও তো ঐ আদর্শের, আন্দোলনের টানেই !

কে আসেননি এই মিছিলে ! সুদূর উত্তরবঙ্গ থেকে এসেছেন চাষীরা, তাঁদের দাবি নিয়ে ; এসেছেন বন্ধ চা-বাগানের শ্রমিকরা, বাগান খোলার দাবি নিয়ে। তাঁরা জানেন, অনেক বড় বড় দল থাকলেও তাঁদের পাশে থেকে লড়াই করছে এই একটিই দল। সি পি এম সহ শাসক দলগুলি আজ যখন দেশের মাঠ, ঘাট, জল, জমি, নদী, বন সব কিছুকেই দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য তাদের হাতে তুলে দিচ্ছে — তার বিরুদ্ধেও প্রতিরোধের প্রাচীর হিসাবে দাঁড়িয়েছে এস ইউ সি আই দল। তাই তো সুন্দরবনের দ্বীপ অঞ্চল 'কে প্লট' থেকে শতাধিক মানুষের সাথে এসেছেন সারথি রানি বেরা। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই জনমজুরের কাজ করেন। তাঁরা আগে ছিলেন শাসক দলের সমর্থক। বললেন, ''সারা বছর কাজ থাকে না। পাঁচটি ছেলেমেয়ে — সকলেরই পড়াশোনা বন্ধ। এখন শুনছি, সরকার সুন্দরবনকেও লিজে দিচ্ছে। এর প্রতিবাদ জানাতে আমরা এলাকায় নাগরিক কমিটি গড়ে তুলেছি। সরকারের কাছে এই প্রতিবাদ পৌঁছে দিতেই মিছিলে এসেছি।'' পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনি থেকে এসেছেন তিনশোরও বেশি মানুষ। বেশিরভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের। সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের উন্নয়নের স্লোগান কতখানি মেকি, ফুটে ওঠে তাঁদের কথায়। অনুপমা মাহাতোরা জানালেন, ''আমরা গরিব খেটে-খাওয়া মানুষ, জমি-জায়গা নেই বললেই চলে, চাষের সময় দেড়মাস কাজ জোটে, ৩০ টাকা মজুরি পাই। বি পি এল কার্ড আমাদের গ্রামে মাত্র দু'জন পেয়েছে, আমরা পাইনি। জঙ্গলে ১০ হাজার পাতা তুললে ২৫-৩০ টাকা পাই। এখন জঙ্গলে ঢোকাও নিষিদ্ধ হচ্ছে। আমরা খাব কী ? বাঁচব কী করে ? এস ইউ সি আই ছাড়া আমাদের কথা বলার আর কে আছে ? তাই আমরা মিছিলে এসেছি।'' বিনপুরের আর একদল আদিবাসী মানুষের সাথে দেখা হল। সংখ্যায় তাঁরা দুশোরও বেশি। তাঁদেরই নিরঞ্জন, সবিতারা বললেন, ''গ্রামে কোনও স্কুল নেই। চার মাইল দূরে ছোটদের প্রাইমারি স্কুল। রাস্তাঘাট নেই, বিদ্যুৎ নেই, বি পি এল কার্ড পাইনি, রেশনে চিনি-গম-চাল কিচ্ছু পাই না।'' জিজ্ঞাসা করলাম — পঞ্চায়েত কাদের ? বললেন, ''ঝাড়খণ্ডী দলের পঞ্চায়েত, গরিব মানুষের জন্য

আটের পাতায় দেখুন

মহামিছিলের পুরোভাগে নেতৃবৃন্দ

‘‘মিছিল তো আমাদেরই দাবি নিয়ে, সমর্থন করি এই আন্দোলন’’

পথের দু’ধারে অপেক্ষমান জনতার অভিমত

মিছিল তো কলকাতায় কতই হয়, বড় আকারেরও হয়। কিন্তু ইদানীংকালে দেখা যায়নি যে, মিছিলের ২/৩ দিন পরেও সেই মিছিল নিয়ে সাধারণ মানুষের গভীর আবেগ, উৎসাহ, আলোচনা মুখে মুখে ঘুরছে; কোন মিছিলের জন্য সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে রাজনৈতিক কর্মীদের অভিনন্দন জানাচ্ছেন। এই বিরল ঘটনাই এবার ২৮ জানুয়ারির মহামিছিলকে কেন্দ্র করে ঘটতে দেখা যাচ্ছে। সেদিন যাঁরা মিছিলের কারণে বহু সময় রাস্তায় আটকে পড়েছিলেন, দীর্ঘপথ যাঁদের বাস থেকে নেমে হাঁটতেও হয়েছে, নির্দিষ্ট কাজ যাঁরা সময়ে করে উঠতে পারেন নি, তাঁরাও অনেকেই পাড়ায় পাড়ায় এস ইউ সি আই কর্মীদের ডেকে ২৮ জানুয়ারির মহামিছিল প্রত্যক্ষ করতে পারার আনন্দের কথা জানাচ্ছেন, এস ইউ সি আই-এর শক্তিবৃদ্ধিকে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি মনে করে গৌরব ও তৃপ্তি বোধ করে বলছেন, ‘তোমরাই পারবে, তোমাদের জয় হোক।’ জনগণের এই প্রতিক্রিয়ায় ধরা পড়ে যায় যে, মিছিল, বন্‌ধ ও গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে মালিকশ্রেণীর স্বার্থে পরিচালিত মিডিয়াগুলোর লাগাতার সংঘবদ্ধ প্রচার, যেটা সাধারণ মানুষের মনের কথা বলে তারা দেখাতে চায়, সেটা বাস্তবে কত একপেশে, এমনকী মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক! আসলে মিডিয়ার মালিকদের ব্যর্থতা এখানেই যে, মানুষের জীবনের দৈনন্দিন বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তারা পাল্টে দিতে পারে না; যে জনগণ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে ‘কে মিত্র, কে শত্রু’ ‘কে ভণ্ড, কে খাঁটি চিনে নেয়, বাইরের চোখ ধাঁধাঁনো প্রচার দিয়ে সেই জনগণের সত্য-মিথ্যার বোধকে, খাঁটি ও মেকির মধ্যে প্রভেদ টানতে পারার চেতনাকে ধ্বংস করা যায় না। ২৮ জানুয়ারির মহামিছিলের মধ্যে সাধারণ মানুষ তাদের জীবনযন্ত্রণার যে প্রকাশ দেখেছে, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য তাদের মনের আকৃতির যে প্রতিফলন পেয়েছে, তাকে মুছে দেওয়ার কী সাধ্য আছে মিডিয়ার!

অবশ্য সেই চেষ্টার এবারও অভাব ঘটেনি। ২৯ জানুয়ারি দেখা গেল, অধিকাংশ সংবাদপত্র এই মহামিছিলের মধ্যে ‘যানজট’ ছাড়া কিছুই পায়নি। এ ব্যাপারে দৈনিক (বাংলা) স্টেটসম্যান পত্রিকা রেকর্ড করেছে বলা যায়। প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে যে মিছিল শ্যামবাজার থেকে ধর্মতলায় গেল, যার সংগ্রামী সুশৃঙ্খল চরিত্র অসংখ্য সাধারণ মানুষের প্রশংসা পেল, ঐ পত্রিকার সাংবাদিক আকস্মিক প্রবল বৃষ্টির সময়টুকু ছাড়া সেই মিছিলকে দেখতেই পাননি; বৃষ্টিতে সাময়িক অবিন্যস্ত মিছিলের মানুষগুলিকে নিয়ে বিদ্রূপ করার মত নিম্নরুচিরও পরিচয় দিয়েছেন তিনি। বোঝা যায় যে, অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে হীন উদ্দেশ্য নিয়েই এই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। সম্পাদকের টেবিল থেকে এমন প্রতিবেদন যখন ছাড়পত্র পেয়ে যায়, বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না যে, মালিক বা কর্তৃপক্ষ, এস ইউ সি আই-এর আন্দোলন সম্পর্কে এমন বিকৃত রিপোর্টই প্রকাশ করতে চায়। তাদের অবশ্য জেনে রাখা ভাল যে, মানুষের নিজেদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে যে রিপোর্ট মেলে না, মানুষ তা গ্রহণও করেনা। তাই এস ইউ সি আই কর্মীরা যখন মিছিলের প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে সংবাদপত্রের এই ধরনের রিপোর্টিং-এর কথা জানিয়েছেন, তখন তাঁরা বলেছেন, ‘কাগজ কী লিখল, তাতে কী আসে যায়! আমরা নিজেরা যা দেখেছি, অন্যের মুখে যা শুনেছি, তাতে কাগজ যদি উল্টো বলে, কে বিশ্বাস করবে? কাগজের কথায় কান দিওনা, এগিয়ে যাও।’ যেমন কলকাতা পুলিশের হিসাবে নাকি এদিন মিছিলে মাত্র ১৫ হাজার মানুষ হয়েছিল! সেদিন উত্তর ও মধ্য কলকাতার কোথাও না কোথাও যে মানুষজন ছিলেন, তাদের একজনও পুলিশের এই তথ্যকে সঠিক ও বিশ্বাস্য বলবেন না। তবুও রাজনৈতিক কর্তাদের হুকুমে পুলিশকে এস ইউ সি আই-এর মিছিল সম্পর্কে মিথ্যা তথ্যই দিতে হয়। শাসকশ্রেণী জানে, যারা মিছিল প্রত্যক্ষ করে তাদের বাইরে থাকে দেশের বিপুল জনসংখ্যা, যারা মিছিল প্রত্যক্ষ করে না। শাসকশ্রেণী চায় এই বিশাল জনসমষ্টির কাছে মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রকৃত গণআন্দোলনের শক্তিকে গুরুত্বহীন করে দিতে। কারণ জনতার সংঘবদ্ধ সংগ্রামী শক্তি ও গণআন্দোলনকেই শাসকরা একমাত্র ভয় পায়। ক্ষমতার দম্ভে ইতিহাসের এই শিক্ষা তারা ভুলে যায় যে, এইভাবে বেশিদিন সত্যকে চেপে রাখা যায় না, গেলে অতীতের কোন অত্যাচারী শাসনেরই পতন হতনা।

ফলে, পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের জানা ছিল যে, লক্ষাধিক মানুষের এই মিছিল সম্পর্কে, সংবাদমাধ্যম হয় নীরবতা দেখাবে, না হয় অর্ধসত্য কিংবা নামমাত্র সংবাদ দেবে। বিশেষ করে তাদের চেষ্টা হবে, মিছিল নিয়ে মানুষের অসুবিধাকেই বড় করে দেখানোর। এজন্য গণদাবীর নিজস্ব উদ্যোগে এবার জনমত সমীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। গণদাবীর কাজে যুক্ত চারজন পার্টি-কর্মী মিছিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মোড়ে মোড়ে অপেক্ষমান, আটকে পড়া মানুষজনের কাছে গিয়ে প্রশ্ন করে তাদের প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করেছেন। এঁরা নিজেদের পরিচয় দিয়েছেন সাধারণ সাংবাদিক হিসাবে, প্রশ্নও করেছেন তাঁদের মত করেই। উত্তরবঙ্গের একজন পার্টি কর্মী নিজস্ব উদ্যোগে এমনই কাজ করেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা লিখিতভাবে গণদাবী দপ্তরে জমা দিয়েছেন। এছাড়াও পার্টির বহু কর্মী, মিছিলে চলতে চলতে পাশে দাঁড়ানো মানুষদের যেসব মন্তব্য শুনেছেন, তাঁদের অভিব্যক্তি ও আচরণ লক্ষ্য করেছেন, তারও বহু রিপোর্ট আমরা পেয়েছি।

২৮ জানুয়ারির মহামিছিল সম্পর্কে কলকাতার মানুষের প্রতিক্রিয়া কী ছিল? মিছিল তখন শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় পেরিয়ে বিধান সরণীতে ঢুকেছে। শত শত মানুষ দাঁড়িয়ে পড়েছেন। এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, মিছিলের পাশে এক ভলান্টিয়ারকে বললেন, তিনি জরুরী কাজে মিছিলের ওপারে যেতে চান, পারবেন কী? কয়েক মিনিট অপেক্ষা করিয়ে, মিছিলের একটি ট্যাবলো আসতেই কর্মীটি ঐ ভদ্রলোককে জানালেন, তিনি এবার ওপারে যেতে পারেন। বললেন, ‘এত বিশাল মিছিলের মাঝে মাঝে ফাঁকা জায়গা রাখাই হয়েছে আপনাদের সুবিধার জন্য।’ ভদ্রলোক ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, ‘মানুষের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে এমন ভাবনা, কেবল এস ইউ সি আই-এর পক্ষেই সম্ভব।’ ফড়িয়াপুকুরের মোড়ে ভ্যানচালক রতন সাহা আটকে পড়েছেন, বারাসতে বাড়ি। মিছিলের জন্য অসুবিধার কথা, একদিনের আয়ে কোপ পড়ার বিপদ নিয়ে প্রশ্ন করতেই তিনি উত্তর দিলেন — ‘পেট নিয়ে তো গোটা বছরই ভাবতে হয়। মিছিলের জন্য অসুবিধা কিছু হচ্ছেই, তবে দাবিগুলো তো সব আমাদেরই, ওরা আমাদের জন্যই বলছে, ভালই করছে।’ উল্টো দিকের দোকান কর্মচারী বছর ৪০ বয়সের পিন্টু ধর স্পষ্টই বলেছেন, ‘অসুবিধা হলেও এই মিছিল আমি সমর্থন করি।’ একই কথা শোনা গেল যশোর রোডে অবস্থিত একটি অ্যালুমিনিয়াম কারখানার কর্মচারী প্রদীপ সাহা এবং অটো চালক কমল জানার গলায়। তাঁদের প্রশ্ন করা হয়েছিল, ‘সমর্থন তো করছেন, ডাকলে মিছিলে যাবেন?’ উত্তরে এঁদের অনেকেই বলেছেন, ‘হ্যাঁ যাব, আন্দোলনে ব্যক্তিগতভাবে অংশগ্রহণ করা উচিত।’ যোগমায়া সুইটস্‌-এর সমীর ঘোষ, সিল্ক প্যালেসের তরুণ চন্দ, এঁরা দোকান কর্মচারী। প্রশ্ন শুনে বলেছেন, ‘এস ইউ সি আই-এর আন্দোলনে পূর্ণ সমর্থন আছে, মাইনে কাটা গেলেও আন্দোলনে থাকব।’ ফুটপাথ ব্যবসায়ী প্রদীপ সাঁতরা এমনকী আন্দোলনের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে নাম লেখানোও জরুরী মনে করেন। মিনু জুয়েলার্স-এর সত্য চন্দ্র ঘোষ বলেছেন, ‘সাময়িক অসুবিধা হলেও এই আন্দোলন চলা উচিৎ।’ এ’রকম অভিব্যক্তি শতকরা ৯০ জন উত্তরদাতার মুখ থেকেই পাওয়া গিয়েছে। মিছিল তখন হাতিবাগান মোড় পার হচ্ছে, হঠাৎ কানে এল, পথের ধার থেকে কয়েকজন যুবক চেঁচিয়ে মিছিল লক্ষ্য করে বলছেন, ‘চালিয়ে যাও, চালিয়ে যাও এস ইউ সি।’ একজন দোকান কর্মচারীকে দেখা গেল, টুল এনে ফুটপাথে বসার তোড়জোড় করতে করতে বলছেন, ‘এমন মিছিল, ভাল করে দেখতে হবে তো।’ রাস্তার ধারে ধারে বাড়িগুলির বারান্দায়, ছাদে মানুষের ভীড়। কয়েকজন হকার বন্ধুকে একত্রে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিছু প্রশ্ন করার কথা ভেবে তাদের দিকে এগোতেই শোনা গেল, ওদের একজন অন্যদের বলছেন, ‘দেখ্‌ মিছিলে সকলেই আমাদের মতন ঘরের লোক, বড়ো বড়ো ব্যাপার নেই।’ বিধান সরণী’র সেন্ট্রাল কলেজ স্কুলের পিওনের কাজ করেন কৌশল মিত্র। কোথাও কাজে যাচ্ছিলেন। মিছিলে বিরক্ত হচ্ছেন কী না, জিজ্ঞাসা করায় বললেন, ‘‘উচিৎ কাজ হচ্ছে, আমি সমর্থন করি।’’ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, একসময় সিপিএম করা এ কে চক্রবর্তী বললেন, ‘এস ইউ সি’র আন্দোলন আমি সমর্থন করি।’ বর্ধমানে বেসরকারী সংস্থায় কাজ করেন সমীর চক্রবর্তী, কিংবা বিধান সরণীর দোকান কর্মচারী বিভু চক্রবর্তী, উভয়েরই বক্তব্য ‘‘আন্দোলন-সংগ্রাম একজনের দ্বারা হয়না। তাই গণকমিটি গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হলে, তাতে সামিল হওয়া উচিত।’’

মিছিল ধীর গতিতে এগোতে থাকলে রাস্তার দু’পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অপেক্ষমান মানুষের নানা মন্তব্য কানে ভেসে আসছিল। কেউ বলছেন, ‘কী শৃঙ্খলা দেখেছিস, অন্য কোন্‌ পার্টির এসব আছে?’ পঞ্চাশোর্ধ্ব এক পথচারীকে চেঁচিয়ে অন্যদের বলতে শোনা গেল — ‘কত মানুষ, কোনও বিশৃঙ্খলা নেই। কী সংগঠিত দল — ভাবা যায়! এই একটা পার্টি মানুষের জন্য লড়াই করে, পুলিশের ডাণ্ডা খেয়েও লড়ে, I am proud of it (আমি এজন্য গর্বিত), এবার ৫০ টাকা চাঁদা দিয়েছি।’ একজন বললেন, ‘এস ইউ সি এখন স্ট্রং পার্টি।’ অপরজন যোগ করলেন, ‘এরা সকলের দাবি নিয়ে লড়ে, তাই পরিবারের সকলেই এ পার্টির সমর্থক হয়ে যায়।’ মিছিলের বিশালতা দেখে একজন বিস্ময় প্রকাশ করাতে অপরজন বললেন, মানুষ আসবেই তো মিছিলে — জিনিসপত্রের দাম, বাসভাড়া, বেকারি, যেভাবে বেড়েই যাচ্ছে, মানুষ বাঁচবে কী করে?’ অনেকে বললেন, ‘এস ইউ সি এত বিরাট হয়ে গেছে? আন্দোলন ও বন্‌ধের মধ্য দিয়ে পার্টিটা বড় হল। আহা! অন্য সব রাজ্যেও যদি এস ইউ সি’র এরকম সংগঠন থাকত, তবে দেশে একটা কাণ্ডই ঘটে যেত।’ একজন বললেন, ‘‘এই পার্টিটাকে মন্ত্রীত্বের কত লোভ দেখাচ্ছে। এরা যাচ্ছে না। বলে দিয়েছে, ওসব ভাগ-বাঁটোয়ারা তোমরা করো, আমরা পাবলিকের পক্ষে থাকব।’

কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের উল্টো ফুটপাতে এক ভদ্রলোক জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও মিছিল ভেঙে যাবেন কিনা, এই দ্বিধায় পড়েছিলেন। একজন ভলান্টিয়ার কর্মী তাঁকে পারাপারে সাহায্য করার পর তিনি যাওয়ার সময় কর্মীটির হাত ধরে বললেন, ‘মিছিল ভেঙে পার হতে মন চাইছিল না, এটা আমাদেরই মিছিল তো!’ মহামিছিলের প্রতি এই বিপুল জনসমর্থনের উৎস এটাই — কলকাতার জনগণও একে তাদেরই দাবিতে তাদেরই মিছিল রূপে গণ্য করেছে।

সূর্য সেন স্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়েছিলেন বিজয় চাঁদ বড়াল। প্রশ্নকর্তা সাংবাদিক পরিচয় দিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন — ‘এসব মিছিল-আন্দোলন করে লোকজনের অসুবিধা ছাড়া অন্য কী লাভ হয়?’ বিজয়বাবু রেগে গিয়ে বললেন, ‘আপনারা সাংবাদিক! কোনও খোঁজই রাখেন না। প্রাইমারিতে ইংরাজি তো এই দলটাই আন্দোলন করে চালু করেছে।’ এক মহিলার কাছে প্রশ্ন রাখা হয়েছিল, ‘এস ইউ সি ছোট পার্টি, এরা কী করতে পারে?’ জবাবে শোনা গেল, ‘ছোট থেকে বড় হবে। আর এরাই তো মানুষের জন্য কাজ করে, বড় দলগুলোর শুধু বড় বড় কথা, কাজ কিছু করেনা।’ এস ইউ সি আই-এর আদর্শভিত্তিক আন্দোলনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্কুল-কলেজ বন্ধ রেখে সি পি এমের দলীয় সম্মেলন

প্রতিবাদ জানাল ডি এস ও

স্কুল-কলেজের ক্লাস বন্ধ রেখে সি পি এমের ছাত্রসংগঠন এস এফ আই এবং শিক্ষক সংগঠন এ বি টি এ নিজেদের দলীয় সম্মেলন করে চলেছে। তার ফলে, একদিকে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশুনার যেমন ক্ষতি হচ্ছে, তেমনি তাদের দৌরাত্ম্য সত্ত্বেও শিক্ষার পরিবেশ যতটুকু বজায় ছিল, তাও ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে ছাত্রসংগঠন ডি এস ও'র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শাখার পক্ষ থেকে রাজ্যের উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কাছে এক স্মারকলিপি প্রেরণ করা হয়েছে।

সেই স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, যেকোন ছাত্রসংগঠনেরই কলেজের মধ্যে সম্মেলন বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার অধিকার থাকা উচিত, কিন্তু কলেজের ক্লাস বন্ধ রেখে এ জিনিস করা কোনমতেই কাম্য নয় — যা প্রেসিডেন্সি কলেজে ঘটে গেল। এই কলেজে পি এল টি-১ গ্যালারিতে প্রথমে পদার্থবিদ্যা বিভাগের ছাত্রদের ক্লাস বন্ধ করে দিয়ে এস এফ আই সম্মেলন করল। কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকেরা অনেকেই অধ্যক্ষের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। অথচ তার কয়েকদিন বাদেই এস এফ আই-এর উদ্যোগে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য অধ্যক্ষ সকাল ১০টা ৫০মিনিটেই কলেজের সমস্ত বিভাগে ছুটি ঘোষণা করে দেন। শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের স্বার্থে কলেজের অধ্যক্ষের এই ভূমিকা বাস্তবে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশের পক্ষে এক বিরাট অন্তরায়।

শুধু প্রেসিডেন্সিতেই নয়, কোচবিহারের একটি স্কুল বন্ধ রেখে শাসকদলেরই শিক্ষক সংগঠন এ বি টি এ'র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। কলকাতার সংস্কৃত কলেজিয়েট স্কুলে সি পি এম প্রভাবিত শিক্ষক সমিতি স্কুল ছুটি দিয়ে মিটিং করেছে। এমনকি, বহু জায়গায় স্কুল বন্ধ রেখে সি পি এম তাদের দলীয় সম্মেলনও করেছে বলে সংবাদমাধ্যমের খবরে প্রকাশিত হয়েছে।

এমনিতে দেশের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে সি পি এম সরকার ১৮তম স্থানে নামিয়ে দিয়েছে। তার উপর নানা দিক থেকেই এখন শিক্ষার পরিবেশ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। স্কুলে-কলেজে অসংখ্য শিক্ষকপদ শূন্য, অস্থায়ী শিক্ষক দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। এমনকী প্রেসিডেন্সি কলেজের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষকের অভাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ক্লাস বিঘ্নিত হচ্ছে। কলেজের সমস্ত কিছুই এখন শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে পরিচালিত হয়। তার উপর যদি শাসক দল ও তার শাখা সংগঠনগুলির নানা কর্মসূচির জন্য স্কুল-কলেজ বন্ধ হতে থাকে, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ অচিরেই যে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, তা ভাবলেও আতঙ্কিত হতে হয়।

দলীয় সঙ্কীর্ণ রাজনীতির স্বার্থে ক্লাস বন্ধ রেখে এভাবে স্কুল- কলেজকে ব্যবহারের ঘটনা অবিলম্বে বন্ধ করে রাজ্যে শিক্ষার সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগী হওয়ার জন্য স্মারকলিপিতে উচ্চশিক্ষামন্ত্রীর কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

ওদের লাভ যত বাড়ে, মানুষ তত কাজ হারায়

২৯ জানুয়ারি সংবাদপত্র জানিয়েছে, দুটি বৃহৎ মার্কিন কোম্পানি 'প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বেল' এবং 'জিলেট' পরস্পর মিশে যাচ্ছে। প্রায় ৫৭০০ কোটি ডলারের বিনিময়ে প্রক্টর অ্যাণ্ড গ্যাম্বেল (পি অ্যান্ড জি) জিলেট কোম্পানিকে কিনে নেওয়ার ফলে বর্তমানে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ভোগ্যপণ্য উৎপাদনকারী সংস্থায় পরিণত হতে চলেছে। এর ফলে তাদের বার্ষিক লাভের পরিমাণ দাঁড়াবে ৬০০০ কোটি ডলারেরও বেশি।

এই সংযুক্তিকরণের পাশাপাশিই প্রক্টর অ্যান্ড গ্যাম্বেল ঘোষণা করেছে যে, তারা তাদের উৎপাদন খরচ অন্তত ১৬ বিলিয়ন ডলার কমাতে চায়। সেই উদ্দেশ্যে তারা প্রায় ৪ শতাংশ কর্মী সঙ্কোচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ফলে কাজ হারাতে চলেছেন প্রায় ৬০০০ কর্মী।

অর্থাৎ, কোম্পানি যত বড় হয়, উৎপাদনের পরিমাণ যত বাড়ে, আরও আরও লাভের উদ্দেশ্যে কর্মীসঙ্কোচনের পরিমাণও তত বাড়ে। কী অদ্ভুত বৈপরীত্য! অথচ সাধারণ বুদ্ধি বলে ঠিক উল্টো কথা। অর্থাৎ, কোম্পানি যত বড় হবে, তার উৎপাদন যত বাড়বে, উৎপাদনের স্বার্থেই আরও নতুন নতুন কাজের সৃষ্টি হবে, আরও বেশি বেশি লোক কাজ পাবে। তাহলে বাস্তবে তার উল্টো হচ্ছে কেন?

আসলে এটাই পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার নিয়ম। এখানে সবকিছুই চলে সর্বোচ্চ মুনাফার স্বার্থে। আর মুনাফা আরো বাড়াতেই এই কর্মী সঙ্কোচন। একচেটিয়া পুঁজির প্রাধান্য যত বাড়ে, এই বৈশিষ্ট্য ততই প্রকট হয়। ফলে যতই উন্নয়ন বা শিল্পায়নের ঢাক পেটানো হোক, আজকের এই একচেটিয়া পুঁজির যুগে তথাকথিত উন্নয়নের গতি যত বাড়ে, মানুষের কাজের সুযোগ তত কমে। অর্থাৎ প্রশ্ন এসেই যায়, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই তথাকথিত উন্নয়নে লাভ আসলে কার? দিল্লির মনমোহন সিং থেকে পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এহেন শিল্পায়নেরই জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। জনগণ সাবধান!

জনতার অভিমত

পাঁচের পাতার পর

রাজনীতি সাধারণ মানুষের হৃদয়কে কীভাবে নাড়া দিয়েছে, তার একটি অদ্ভুত অভিব্যক্তি পাওয়া গেল এক মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির কণ্ঠে। তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'পলিটিক্স মানেই এখন নোংরামি। পলিটিক্যাল পার্টিগুলোকে আপনারা তো ঘৃণা করেন, এস ইউ সি আইকে সমর্থন করছেন কেন?' কী জবাব দেবেন, সেটা ভাবতে কয়েক সেকেন্ড নীরব থেকে বললেন, 'এস ইউ সি পলিটিক্যাল পার্টি নয়,' অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চাইলেন, আজকাল রাজনীতির নামে যা চলছে, এস ইউ সি আই তা করে না।

পরের দিন কলেজ স্ট্রীটের বই পাড়ার ফুটপাতে দাঁড়ানো এক দোকানি ভদ্রলোক, এক পরিচিত ছাত্রী কর্মীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিছিলে কত লোক হয়েছিল বলতে পার?' কর্মীটি ইতস্তত করে বলেছিল, '৭০/৮০ হাজার হবে বোধ হয়।'' ভদ্রলোক হেসে বললেন, ''কিছুই বোঝ না, কম করে ১ লক্ষ ২০ হাজার মানুষ হবে। এর আগে এতো বড় মিছিল তোমাদের পার্টির হয়নি।'' এদিন মিছিলে লোক কত হয়েছে, ১ লাখ না ২ লাখ, তা নিয়ে জোর আলোচনা হয়েছে মানুষের মধ্যে।

লক্ষাধিক মানুষের এই মিছিল হঠাৎ যখন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে অসুবিধায় পড়েছে, নারী-শিশু-বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা জলে ভিজেছেন, তখন সেই অসুবিধায় ও কষ্টে ব্যথা পেয়েছেন পথের ধারের সাধারণ মানুষজন; এতটাই মিছিলের সাথে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন কলকাতার জনগণ।

গণদাবীর পক্ষ থেকে চার জনের একটি টিম রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে।

প্রবীণ পার্টি সংগঠকের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর থানার অন্তর্গত খাজুরা অঞ্চলের সেনেড়া গ্রামের প্রবীণ সংগঠক কমরেড অমর ঘোষাল গত ৭ ডিসেম্বর ২০০৪ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর।

প্রথমে তিনি আর সি পি আই দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কিন্তু ১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলনে এস ইউ সি আই-এর নীতি-আদর্শ এবং সংগ্রামী ভূমিকা লক্ষ্য করে তিনি মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তা ও আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এস ইউ সি আই-এর সাথে নিজেকে যুক্ত করেন। তিনি গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুরদের বিভিন্ন দাবি নিয়ে বহু আন্দোলন পরিচালনা করেন। অসংখ্য সাধারণ মানুষের কাছে তিনি এস ইউ সি আইকে শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। যখন যেখানে সাধারণ গরিব মানুষ বিপদে পড়েছে বা তাদের উপর অবিচার নেমে এসেছে তৎক্ষণাৎ তিনি ছুটে গেছেন, বিপন্ন মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সাহায্য করেছেন। তিনি বিস্তীর্ণ এলাকায় পায়ে হেঁটে সংগঠনের কাজ করেছেন এবং এভাবেই তিনি গরিব সাধারণ মানুষের একজন আপনজনরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

গত ৭ জানুয়ারি তাঁর গ্রাম সেনেড়ায় তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষ কমরেড ঘোষালের জীবন সংগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষণীয় দিক তুলে ধরেন। পুরুলিয়া জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড ভাস্কর ভদ্রও তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান এবং বলেন, তাঁর মৃত্যুতে দল একজন দক্ষ সংগঠককে হারাল।

কমরেড অমর ঘোষাল লাল সেলাম

সুনামি বিধ্বস্ত আন্দামানে এস ইউ সি আই-এর ত্রাণশিবির

সুনামির প্রচণ্ড আঘাত ভারতবর্ষের পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও পুঁজিবাদী সরকারের জনবিরোধী চরিত্র এক টানে খুলে দিয়েছে। এদেশে অস্ত্র কেনা হয় বছরে ১৪,০০০ কোটি টাকা, প্রতিদিন লোকসভা চালাতে খরচ হয় ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। অথচ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মাসাধিককাল পরেও আন্দামান-নিকোবরে মানুষ পাহাড়ের ওপর থাকতে বাধ্য হচ্ছেন। আমরা এও দেখেছি, মুনাফার জন্য সেক্স-ট্যুরিজমের ব্যবসার স্বার্থে যেখানে উপকূলের বন ধ্বংস করা হয়েছে, সেখানে ক্ষতি হয়েছে অনেক বেশি। দ্বীপপুঞ্জে রিলিফের কাজ করতে গিয়ে এস ইউ সি আই কমরেডদের অভিজ্ঞতা হয়েছে মর্মান্তিক। বিশেষত, লিট্‌ল আন্দামানে বিভিন্ন স্কুলবাড়িতে আশ্রয় নেওয়া দুর্গত মানুষদের ফিরে যাওয়ার কোনও উপায় নেই। নিজেদের পুরনো জায়গায় ঘরবাড়ি সহায়সম্বল কিছু নেই। রোজগারের উপায় নেই। এদিকে মাসাধিককাল স্কুল বন্ধ, প্রশাসন তাড়া দিচ্ছে স্কুল খালি করে দিতে। কৃষিজমিতে ঢুকেছে সাগরের নোনা জল। আগামী কয়েক বছর চাষ হবে না। কী খাবে, মানুষ জানে না। উপযুক্ত খাদ্য নেই, চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, স্যানিটেশনের ব্যবস্থা নেই — অনাহার, মহামারী এবং বার বার কেঁপে ওঠা দ্বীপে আবার সুনামির আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে অসহায় মানুষ।

ত্রাণের কাজে সরকারি প্রতিশ্রুতি কেমন পালিত হয়, তা দেশের মানুষের অজানা নয়। ২০০১ সালের গুজরাটের ভূমিকম্পে দুর্গতদের মধ্যে বিশেষত যারা গরিব তাদের আজও পুনর্বাসন হয়নি। ১৯৯৯ সালে ওড়িশার জগৎসিংহপুরের সুপার সাইক্লোনে সর্বস্ব হারানো মানুষরা আজও স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারেননি। এমনকী বিশ বছর আগে ভোপাল গ্যাসকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তরা আজও প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণের টাকা পাননি। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দেশের মূল ভূখণ্ডের দুর্গত মানুষদের যেখানে এই হাল, সেখানে কেরালা, তামিলনাড়ুর প্রান্তবাসী মানুষের কিংবা সুদূর আন্দামানের, ততোধিক দূরের লিট্‌ল আন্দামানের গরিব মানুষের ভবিষ্যৎ কী তা সহজেই অনুমেয়। বুর্জোয়া সরকারগুলির সৌভাগ্য এই যে, নিদারুণ দারিদ্র্য ও অসহায়তায় মানুষ ভবিষ্যৎ ভাবার ক্ষমতাটাও হারায়।

কিন্তু নিদারুণ বর্তমানের নিরিখেই সে চেনে তার শত্রু মিত্র। অভিজ্ঞতা থেকেই সরকার ও প্রশাসনের ওপর বিশ্বাস তারা হারিয়েছে। কলকাতা থেকে স্বেচ্ছাসেবী জনস্বাস্থ্য সংগঠন মেডিকেল সার্ভিস সেন্টার ও বিজ্ঞান সংস্থা ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটির চিকিৎসক ও বিজ্ঞানীরা ১৫ জানুয়ারি পোর্ট ব্লেয়ারে পৌঁছানোমাত্র এলাকার অন্যান্য কিছু সংগঠন যেমন তাদের পাশে দাঁড়ায়, তেমনি দ্বীপের এস ইউ সি আই কমরেডরা তাঁদের সহায়তা শুরু করে এবং দলের আহ্বান অনুযায়ী ত্রাণকার্যে নেমে পড়ে। পার্টির মেডিকেল টিম ২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত যে ত্রাণকার্য চালায়, দলের কমরেডরাও তাতে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করে। এছাড়াও তামিলনাড়ুর কাড্ডালোর ও নাগপট্টিনমে ৩০টি ভ্রাম্যমান রিলিফ টিম কাজ করে। কেরালার কুইলন জেলা ছাড়াও আলেপ্পি জেলায় অন্যান্য ত্রাণসাহায্যের সঙ্গে অ্যাম্বুলেন্সের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

আন্দামানে রিলিফ ক্যাম্পে চিকিৎসা করছেন কমরেড ডাঃ অশোক সামন্ত

প্রকৃতির ভয়াল রূপ ছিল ক্ষণস্থায়ী কিন্তু মানুষের সমস্যা দীর্ঘমেয়াদী। বেসরকারিভাবে এর সুষ্ঠু সমাধান কোনভাবেই সম্ভব নয়। তাই আমরা দাবি জানাচ্ছি, অবিলম্বে দুর্গত মানুষদের জন্য জীবনধারণ ও জীবিকা অর্জনের ব্যবস্থা সরকারকে করতে হবে।

শোষণমূলক রাষ্ট্র সাধারণ মানুষের প্রাণের মূল্য দেয় না

তিনের পাতার পর

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ক্ষমতা নেই এই শোষণমূলক রাষ্ট্রশক্তিকে পরিবর্তিত করে মানবিক গুণসম্পন্ন করে তোলার। শ্রমিক-কৃষকের জীবন বাঁচানোর লক্ষ্যে তাদের সহযোগী শক্তি হিসাবে এরা কোনদিনই কাজ করবে না।

ছোট্ট দেশ কিউবা যে পদ্ধতিতে কাজ করে সারা পৃথিবীর মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, সে পদ্ধতি অনুসরণ করতে এইসব দেশ রাজি নয়। জনসাধারণকে বিপদের মোকাবিলায় প্রস্তুত করে গণউদ্যোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা এদের নেই। প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে এরা জনগণের ওপর প্রভুত্ব খাটায়। চারিদিকে ছেয়ে যায় হিংস্রতা ও অবিশ্বাসের আবহাওয়া। শোষকশ্রেণী তাদের নিজেদের স্বার্থেই সাধারণ মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। এদেরই জন্য মানুষ একাকী অসহায় অবস্থায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে, ভাবী বিপর্যয়ের আগাম সতর্কবার্তাটুকুও সে জানতে পারে না।

জনসাধারণকে একমাত্র মিলিটারিবাহিনীর মধ্যে সংগঠিত করতেই বুর্জোয়ারা আগ্রহী, যে মিলিটারিবাহিনীর কাজ হল একদিকে পুঁজির শোষণের স্বার্থে কাজ করা এবং অন্যদিকে কলে-কারখানায়, খনিতে এবং অফিসে অফিসে সংগঠিত শ্রমশক্তিকে ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া। এ হল পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। সাম্রাজ্যবাদী দেশই হোক, আর পুঁজিবাদী শাসনাধীন নিপীড়িত, অনুন্নত দেশই হোক — সর্বত্রই এ জিনিস দেখতে পাওয়া যায়।

এবার সুনামির তাণ্ডবে যে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তা পূরণ করতে প্রয়োজন বিপুল সম্পদের। প্রতিটি সমাজেই তৈরি হয় বিপুল পরিমাণ উদ্বৃত্ত সম্পদ, যা সৃষ্টি করে সমাজের শ্রমজীবী মানুষ। কিন্তু পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় এই উদ্বৃত্ত সম্পদ লুঠ করে নেয় পুঁজিপতিরা। এই সম্পদ পুঁজি নাম নিয়ে পুঁজিমালিকের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসাবে আরও মুনাফা তৈরি করার কাজে ব্যবহৃত হয়। পুঁজিবাদের সম্পত্তি-সম্পর্কই এই উদ্বৃত্ত সম্পদকে সাধারণ মানুষের কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে।

কিউবায় এই সামাজিক উদ্বৃত্ত সম্পদের মালিক হল সেদেশের সাধারণ মানুষ। সেদেশের সমাজতান্ত্রিক সরকার সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে ঐ অর্থ ব্যয় করে।

পুঁজিবাদ এখন অচল

সাম্রাজ্যবাদী শাসনে **পেন্টাগন, মিলিটা**রি-ইন্ডাস্ট্রিয়াল চক্র, এফ বি আই, সি আই এ, বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানি এবং শোষক বহুজাতিক কোম্পানিগুলি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে মুনাফা অর্জন ও জনগণকে দমনপীড়নের কাজে লাগায়। পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহার করে শ্রমিকদের বাধ্য করে কম মজুরির বিনিময়ে দীর্ঘ, কষ্টসাধ্য কাজ দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করতে। এইভাবে পুঁজিপতিরা শোষণের মাত্রাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। আমেরিকায় মহাকাশ-যুগের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় শ্রমজীবী মানুষকে ১৯ শতকের পরিস্থিতিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। মানুষের স্বার্থে বিজ্ঞানকে কাজে লাগানোর সমস্ত প্রয়াসই পুঁজিবাদের রীতিবিরুদ্ধ। গোটা বিশ্বের সমস্ত সমাজ সচেতন বিজ্ঞানীরা সে চেষ্টা চালালেও পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী সমাজে, বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক নীতির উপর এঁরা কোনও প্রভাবই ফেলতে পারেন না। বরং গবেষণার কাজে প্রয়োজনীয় অর্থ পাওয়ার জন্য বুর্জোয়া সরকারগুলির কাছে এঁদের হাত পাততে হয়। এইসব বিজ্ঞানীদের দেওয়া কোনও প্রস্তাব বৃহৎ শিল্পপতিদের স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলে তবেই সেইসব প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখা হয়।

অন্যদিকে কিউবার সমাজতান্ত্রিক সরকারের নেতৃবৃন্দ সাধারণ মানুষকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে সদা সচেষ্ট। সেদেশের বিজ্ঞানমহলের একমাত্র কাজ সরকারের সঙ্গে মিলেমিশে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার উন্নয়ন ঘটানো। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, যা সমস্ত মানুষের যৌথ সংগ্রামের ফসল — কিউবার সমাজতান্ত্রিক সরকার, মানুষের স্বার্থে তা সমাজপ্রগতির কাজে লাগিয়েছে। সেদেশে সরকারের নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে পারস্পরিক আস্থার সম্পর্ক, সাধারণ মানুষের নিজেদের মধ্যেও গড়ে উঠেছে দৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধ। এই পথেই তারা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে সফলতম লড়াই জারি রেখেছে। প্রকৃতপক্ষে,পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দূর করতে না পারলে কোনও সরকারের পক্ষেই সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

সুনামির ভয়ঙ্কর তাণ্ডবের মুখে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর অকর্মণ্যতায় হাজার হাজার মানুষের এই করুণ মৃত্যু, যা সহজেই এড়ানো যেত, মার্ক্সবাদের একটি গভীর সত্যকে আবার মনে করিয়ে দেয় — মানবপ্রগতির পথে পুঁজিবাদ আজ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ; পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আজকের দিনে অচল। তাই পুঁজিবাদ ধ্বংস করে সমাজতন্ত্র কায়েম করতে হবে।

সুনামি ও নারী ব্যবসা

"সুনামি জলোচ্ছ্বাসে যে মহিলারা স্বামী হারিয়েছেন, যে শিশুরা বাবা-মাকে হারিয়ে অনাথ হয়েছে তাদের দিকে এবার লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে নারী ও শিশুপাচারকারী চক্রের। কোথাও মড়ক লাগলে যেমন শকুনেরা এসে আকাশে উড়তে থাকে তেমনই অসহায় দরিদ্র মহিলাদের দেহব্যবসায় নামিয়ে, আর অনাথ শিশুদের বিক্রি করে মোটা টাকা কামানোর ফন্দি আঁটছে এই পাচারকারীরা।" বলেছেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান বিচারপতি এ এস আনন্দ (*দি স্টেটসম্যান* ১১-১-০৫)।

ভয়ঙ্কর সুনামি প্লাবন লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, অগণিত জনপদ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে বিশ্বের যে অঞ্চলে সেটা হল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া। প্রধানত গরিব দেশে। এই সুযোগে ধনী লুঠেরা সাম্রাজ্যবাদীরা দেখাতে চায় গরিব দেশের ভালমন্দ নিয়েও তারা ভীষণ রকম চিন্তিত। কোটি কোটি ডলার ত্রাণসামগ্রীর ঢালাও প্রতিশ্রুতির বন্যা তারা বইয়ে দিচ্ছে, যার বেশিরভাগই বাস্তবে তারা দেবে না। এমনকী ভারত সরকারও জাহাজ ভর্তি ত্রাণ পাঠিয়েছে মালয়েশিয়ায়, শ্রীলঙ্কায়। ত্রাতার ভূমিকা তাকে আঞ্চলিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারে সুযোগ করে দেবে। সেক্স-ভায়োলেন্সের কারবার করে ধনকুবের হওয়া দেশ-বিদেশের ফিল্মজগতের মেগাস্টাররাও, যাদের অনেকের সঙ্গে স্মাগলার ড্রাগব্যবসায়ী বৃহৎ মাফিয়াদের যোগাযোগ এখন সকলেরই জানা, তারাও রাতারাতি মানবদরদী ভাবমূর্তি গড়ে তোলার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে গিয়ে তার সদ্ব্যবহার করতে কসুর করছেন না। ভাবমূর্তিটা তাদের পেশার ক্ষেত্রে পুঁজির কাজ করবে। এরই আড়ালে ভয়াবহ দুষ্ট ক্ষতের মত নিঃশব্দে বিস্তৃত হচ্ছে নিকৃষ্টতম অপরাধমূলক ব্যবসার অদৃশ্য জাল — বিচারপতি আনন্দ যাকে বলেছেন 'মানবতার ওপর জঘন্যতম আঘাত' — কমপক্ষে আট-শো কোটি ডলারের (৩৬ হাজার কোটি টাকার) ব্যবসা — শুধু মানুষ বেচাকেনায়। দিন কয়েক আগেই একটি ইংরেজি দৈনিকের প্রথম পাতার খবরে জানানো হল, শ্রীলঙ্কা থেকে অনাথ শিশুভর্তি একটি ছোট জাহাজ কলকাতার দিকে যাচ্ছে, কলকাতা পুলিশকে সতর্ক করা হয়েছে। কলকাতা পুলিশ জানাল তারা সতর্ক। ব্যস, এইটুকুই।

বেশ কয়েক শতাব্দী আগে দাসব্যবসায়ীরা আফ্রিকা আর লাতিন আমেরিকার মানুষদের বন্য পশুর মতো ধরে, শেকল দিয়ে বেঁধে, জাহাজ ভর্তি করে এনে বিক্রি করে অজস্র অর্থ উপার্জন করেছিল। প্রধানত মার্কিন দেশে দক্ষিণাঞ্চলে প্রচলিত আধুনিক ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধে লড়াই করে এই অমানবিক প্রথাকে উচ্ছেদ করতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন। বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ আফ্রিকার মানুষের সেই মর্মান্তিক ইতিহাস স্মরণ করে তীব্র বেদনার সঙ্গে লিখেছিলেন — 'সভ্যের বর্বর লোভ নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা'। আর আজকে, একবিংশ শতাব্দীর ভারতে, আধুনিকতা, উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি, বিনিয়োগের ঢাকঢোল পিটিয়ে কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি — সবকটা শাসকদল একদিকে দেশবাসীকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে, দেশের উন্নতি হচ্ছে, আধুনিকীকরণ হচ্ছে, বিশ্বায়নের কারবারীরা বিপুল আনন্দে বলছে, ভারতের দরজা বিশ্ব পুঁজির জন্য খুলে গেছে, ফলে উন্নতি আটকায় কে? আবার তারই আড়ালে প্রশাসনের নাকের ডগায় রমরম করে চলছে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে সর্বস্বহারা অসহায় মহিলা, শিশুদের বিক্রি করে মুনাফা কামানোর দেশি-বিদেশি কারবার। এদেশে মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে, বেরোজগারির বিরুদ্ধে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তার দাবিতে মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ করতে গেলেও পুলিশ-প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়ে। আন্দোলনকারীদের লাঠিপেটা করে, তুলে নিয়ে যায়, মিথ্যা মামলা দিয়ে জেল জরিমানার ভয় দেখায়। কিন্তু নারীপাচার, শিশুপাচারের মত জঘন্য ব্যবসা বন্ধ করার জন্য পুলিশ-প্রশাসন-মন্ত্রীদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কারণ, এই পুলিশ-প্রশাসন- মন্ত্রীরা যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রক্ষক ও সেবাদাস সেই পুঁজিবাদই মানুষকে পণ্যে পরিণত করেছে। সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীলতার নিগড় ভেঙে ব্যক্তিস্বাধীনতা নারীমুক্তির স্লোগান তুলে প্রতিষ্ঠা যে পুঁজিবাদের, সে কিন্তু সমাজে শ্রেণীশোষণের অবসান ঘটাতে পারেনি, প্রকৃত নারীমুক্তিও আনতে পারেনি, বরং শ্রেণীশোষণকে আরও সংহতই করেছে। গণিকালয়কে সে জনপদের অঙ্গ করে রেখেছে। প্রাচীন পৃথিবীতে গণিকা ছিল কেবল অভিজাত গোষ্ঠীর ভোগ্যা। পুঁজিবাদ তাকে খোলা বাজারের পণ্যে পরিণত করেছে। নারীর দেহব্যবসা আজ পুঁজিবাদের সঙ্গেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজই নারীপুরুষ উভয়কেই শোষণের সম্পর্ক থেকে মুক্ত করতে পারে, তাই সমাজতান্ত্রিক সমাজেই নারীকে তার এই চরম অবমাননার হাত থেকে মুক্তি দেওয়া সম্ভব। পূর্বতন সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন তা হাতেকলমে প্রমাণ করে দেখিয়েছিল।

শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশন প্রথা ও শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণের বিরুদ্ধে সিকিমে ছাত্রআন্দোলন

পার্বত্য রাজ্য সিকিমের ছাত্রসমাজও আন্দোলনের হাতিয়ার হিসাবে ডি এস ও-কেই বেছে নিল। সারা দেশের মতো সিকিমের ছাত্রসমাজও শিক্ষাক্ষেত্রে ফি-বৃদ্ধি, ডোনেশন এবং বাণিজ্যিকীকরণের সমস্যার সম্মুখীন। অথচ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলার মতো কোন হাতিয়ার তাদের ছিলনা। শিক্ষার এই সমস্যাগুলির বিরুদ্ধে দেশের প্রান্তে প্রান্তে ডি এস ও'র আন্দোলন তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়েই সিকিমের কিছু ছাত্র ২০০২ সালে বাঙ্গালোরে ডি এস ও'র সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ২০০৪-এ জলপাইগুড়ি শহরে পূর্বভারতীয় রাজনৈতিক শিক্ষাশিবিরেও তাঁরা যোগ দেন। ডি এস ও'র ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে তাঁদেরই একটি দল গত ২৮ ডিসেম্বর কলকাতায় এসেছিলেন। তাঁরা ডি এস ও'র লক্ষ্য, আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত হয়েই সিকিমে ছাত্রআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি গড়ে তোলেন।

ডি এস ও'র সর্বভারতীয় কমিটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে সিকিম রাজ্যেও 'শিক্ষার অধিকার দিবস' পালিত হয়। ২৪ জানুয়ারি গ্যাংটকের রংফুতে রাজ্যপালের কাছে দাবিপত্র পেশ করা হয়। দাবি ছিল, শিক্ষায় ফি-বৃদ্ধি করা চলবে না, শিক্ষার বেসরকারীকরণ-ব্যবসায়ীকরণ চলবে না, ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষা চালু করতে হবে, সিকিমে সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে, দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করতে হবে, গবেষণাকেন্দ্র ও কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার স্থাপন করতে হবে এবং সার্বজনীন সাক্ষরতার জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করতে হবে। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কমরেড রমেশ শর্মা, দীপক শর্মা, সন্তোষ ছেত্রী, কৃষ্ণ দুয়ারী প্রমুখ।

পুনরায় বাসভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে ২৭ জানুয়ারি সারা বাংলা পরিবহণ যাত্রী কমিটির বিক্ষোভ সমাবেশ

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

২১ জানুয়ারি মহান লেনিনের ৮১তম মৃত্যুবার্ষিকীতে লেনিনের প্রতি বিপ্লবী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন করে লেনিনের প্রতিকৃতিতে মাল্যার্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন দলের কেন্দ্রীয় কমিটির অফিস সম্পাদক কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। পাশের ছবিতে কলকাতার এসপ্লানেডে লেনিনের মূর্তিতে মাল্যদান করে লালসেলাম জানাচ্ছেন কমরেড অসিত ভট্টাচার্য ও রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য কমরেড মানিক মুখার্জী।

২৮ জানুয়ারির মহামিছিল

চারের পাতার পর

কিচ্ছু করেনি। আমাদের দাবি জানাতেই মিছিলে এসেছি।'' বর্ধমানের লাউদোহা থেকে এসেছেন কৃষিজীবী শ'খানেক মানুষ। ফসলের খরচের তুলনায় দাম পাননি তাঁরা — ধানের সরকার-নির্ধারিত দামটুকুও নয়। এর প্রতিবাদেই সামিল হয়েছেন মিছিলে। বাঁকুড়ার তালডাংরা থেকে অন্যদের সাথে এসেছেন একদল ছাত্র। লাফিয়ে বাড়ছে ফি, সেই হারে ডোনেশনও। পড়াশোনা বন্ধ হয়েছে অনেকেরই। এর প্রতিবাদ জানাতেই তাদের মিছিলে আসা। ওন্দা থেকে আসা হাইস্কুলের ছাত্ররা ডি এস ও'র নেতৃত্বে স্কুলে অনশন করে ফি-বৃদ্ধি প্রতিরোধ করেছেন। নদীয়ার দেবগ্রাম থেকে এসেছেন ৭০ জন চাষী। সি পি এম-ফ্রন্ট সরকারের শাসনে কৃষকের সমস্ত অধিকার কীভাবে বৃহৎ ব্যবসায়ী-মিল মালিকদের কুক্ষিগত হয়েছে, তা উঠে এসেছে তাঁদের কথায়। শুকচাঁদ শেখ বললেন, ''আমাদের এলাকায় কলা চাষ বেশি। এখন কলার কাঁদি ১০-২০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে — চাষের খরচও ওঠে না। পাট চাষীরা সাড়ে ছ'শো-সাতশো টাকায় পাট বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। চাষীদের ঘরে আর পাট নেই। এখন দাম ১১৫০-১২০০ টাকা। এই অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই মিছিলে এসেছি আমরা।'' দক্ষিণ দিনাজপুরের সুদর্শন নগর স্কুলের ছাত্র অজয় টুডু, নিখিল রাই'রা তিন বছর স্টাইপেন্ড পায়নি, স্কুলে ফি হয়েছে দ্বিগুণ — এর প্রতিবাদে তারা মিছিলে এসেছে। মিছিলে দেখা মিলল জুট মিলের একদল শ্রমিকের। বললেন, ''জুটমিল মালিকদের সাথে যোগসাজশে কালাচুক্তির প্রতিবাদ জানাতেই আমরা মিছিলে এসেছি''। মুর্শিদাবাদের তানিয়া বেগমকে প্রশ্ন করতেই বললেন,''আমাদের জেলা থেকে মেয়ে পাচার হয় সবচেয়ে বেশি, আমার গ্রাম থেকেও হয়েছে। আমরা লড়ছি তার বিরুদ্ধে। সেই লড়াইয়ে আমাদের পাশে আছে এই পার্টি। তাই আমরা মিছিলে এসেছি''।

মিছিলের লক্ষাধিক মানুষ প্রত্যেকেই এসেছেন তাঁদের জীবনের দাবি নিয়ে ; তাঁদের বুকের মধ্যে গুমরে ওঠা অভিযোগ যেন এই মিছিলে প্রাণ পেয়েছে। তাই মিছিলের দু'ধারে দাঁড়ানো হাজার হাজার মানুষের প্রসন্ন দৃষ্টি যেমন মিছিলকারীদের অভিষিক্ত করেছে, তেমনি মহান নেতা শিবদাস ঘোষের শিক্ষাকে জীবনে গ্রহণ করে, চলমান এই গণআন্দোলনকে যাঁরা জ্ঞান-অভিজ্ঞতা দিয়ে গড়ে তুলেছেন, নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদেরও সংবর্ধনা জানালেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে কলেজ স্ট্রিট ফুটপাথের পুস্তক ব্যবসায়ী ও কর্মচারীরা। রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের হাতে তাঁরা পুষ্পস্তবক তুলে দিলেন। মিছিলের হাজার হাজার মানুষ করতালি দিয়ে সেই অভিনন্দন ফিরিয়ে দিলেন তাঁদেরও। বিশ্ববিদ্যালয়ের উল্টোদিকের মঞ্চে তখন স্লোগান দিচ্ছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রেসিডেন্সি কলেজের একদল ছাত্র। মিছিল এগিয়ে চলল কলেজ স্ট্রিট ধরে। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আটকে পড়েছেন বহু মানুষ। হাওড়া থেকে সাইকেল নিয়ে কাজে এসেছিলেন সঞ্জীব ধাড়া। দেড় ঘন্টা ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। মিছিলে তাঁর ক্ষতি হল কিনা জিজ্ঞাসা করায় জানালেন, ''ক্ষতি তো একটু হচ্ছেই। কিন্তু বহু মানুষের দাবি জানাতে গেলে এই ক্ষতিটুকু তো স্বীকার করতেই হবে।'' বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন কলেজ ছাত্র তামস ভঞ্জ। মিছিলে আটকে পড়ে অসুবিধা হচ্ছে কি না জিজ্ঞাসা করায় বললেন, ''মিছিল তো রাস্তাতেই হবে, আর মিছিল ছাড়া সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের আর কী-ই বা উপায় আছে !'' সাবাস ! কে বলে আধুনিক প্রজন্ম মিছিলের বিরুদ্ধে ! কে বলে মিছিলে আটকে পড়লেই মানুষ বিরক্ত হয় ! ওয়েলিংটনের মোড়ে রাস্তার ধারে মঞ্চ করে স্লোগান দিচ্ছেন এস ইউ সি আই-এর মধ্য কলকাতার কমরেডরা। মঞ্চে দাঁড়িয়ে রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড সঞ্জিত বিশ্বাস।

মহামিছিলে যুবসমাজের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। যাঁরা বলেন, এখনকার যুবসমাজ রাজনীতিবিমুখ, তাঁরা সর্বটাই ঠিক বলেন না। এবারের মিছিল তারই প্রমাণ রেখে গেল। হাজারে হাজারে যুবক-যুবতী এসেছিলেন এই মিছিলে। কেন এসেছেন এই মিছিলে ? — উত্তর দিলেন দুই বেকার যুবক উত্তম পাল আর কার্তিক শীট। বললেন, ''বেকারে দেশ ছেয়ে গেল। গ্রামে কাজের কোনও সুযোগ নেই। শহরে কলকারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। সরকার সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে মদের ঢালাও লাইসেন্স দিয়ে যাচ্ছে। আমাদের দাবি নিয়ে তো অন্য কোনও দল আন্দোলন করছে না — তাই এসেছি এই মহামিছিলে।'' প্রশ্ন করি, মিছিলে যদি দাবি আদায় না হয় ? উত্তর দিলেন চিত্তরঞ্জনের যুবক তপন মণ্ডল — ''তবে আবারও আন্দোলন হবে, আবারও মিছিল হবে''। মিছিলের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা শাসকদল সি পি এমের বেশ কিছু কর্মী-সমর্থকদের অংশগ্রহণ। সি পি এম নেতৃত্বের সংগ্রামবিমুখতা, শোষকশ্রেণীর সাথে ঘনিষ্ঠতা এবং শোষকশ্রেণীর পায়ে মেহনতি মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেওয়ার তাদের মানসিকতা ক্রমশ ঐ দলের বহু সৎ কর্মীদেরই গণআন্দোলনের শক্তি এস ইউ সি আই-এর দিকেই আকৃষ্ট করছে। এইরকমই একজন নদীয়ার দীঘল গ্রামের দীপঙ্কর মণ্ডল। বললেন, ''মুখে বামপন্থার কথা বললেও ওদের কাজ সব উল্টো। আজ আর সি পি এম অন্যায়ের প্রতিবাদ করেনা।'' এইরকমই আরও অসংখ্য মানুষ রয়ে গিয়েছেন যাঁরা মিছিলে আসতে পারেননি, কিন্তু স্বাক্ষর দিয়েছেন, অর্থ দিয়েছেন, সমর্থন দিয়েছেন।

মিছিলের সম্মুখভাগ কলকাতা কর্পোরেশনের সামনে যেতেই শুরু হল মুষলধারে অকালবর্ষণ। সাময়িক একটু বিশৃঙ্খলা কাটিয়ে নিয়ে এগিয়ে চলল মিছিল। স্তম্ভিত দু'পাশের সাধারণ মানুষ তাকিয়ে আছেন অবাক বিস্ময়ে। মন্তব্য করেছেন —''এ একমাত্র এই দলের পক্ষেই সম্ভব !'' মিছিলকারীদের অসুবিধা ও কষ্টের সমব্যথী হয়ে পড়েন দু'পাশের সাধারণ মানুষ। প্রবল বৃষ্টিধারায় হাজার হাজার মা-বোন-বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের ভিজে ভিজে মিছিলে যেতে দেখে পরের দিন কলেজ স্ট্রিটের এক দোকানদার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রীকর্মীকে বলেন, ''জানো, বৃষ্টিতে তোমাদের ঐ ভেজা দেখে কী কষ্ট যে পেয়েছি, রাতে আমি ঘুমোতে পারিনি।'' সাধারণ মানুষের এই সমর্থন ও ভালবাসাই তো গণআন্দোলন ও বিপ্লবী আন্দোলনের এগিয়ে চলার পাথেয় !

মিছিল ধর্মতলায় রানি রাসমণি রোডে পৌঁছালে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের নেতৃত্বে কমরেড সদানন্দ বাগল, কমরেড তপন রায়চৌধুরী এবং কমরেড শঙ্কর সাহা রাজভবনে গিয়ে দু'কোটি মানুষের স্বাক্ষরিত দাবিপত্রগুলি রাজ্যপালের সেক্রেটারির হাতে তুলে দেন। রাজ্যপালের উদ্দেশে একটি আলাদা দাবিপত্র তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য যে, দাবিগুলি নিয়ে রাজ্যপালের সাথে আলোচনার জন্য সময় চাওয়া হলে পূর্বেই জানানো হয় যে, তিনি এদিন উপস্থিত থাকতে পারবেন না। পরবর্তীকালে এস ইউ সি আই প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার জন্য তিনি দিন ও সময় জানাবেন।

কমরেড নগেন্দ্র শর্মার জীবনাবসান

গত ১৮ জানুয়ারি মধ্যরাতে এলাহাবাদ শহরের স্থানীয় হাসপাতালে এস ইউ সি আই উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড এন কে শর্মার জীবনাবসান ঘটেছে। এলাহাবাদে দলের কাজ যাঁরা প্রথম শুরু করেন, কমরেড শর্মা ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ১৯৭১ সালে কমরেড শর্মা দিল্লিতে চাকরিরত অবস্থায় দলের বর্তমান কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীর সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর দিল্লিতে দলের এক শিক্ষাশিবিরে তিনি যোগ দেন, যে শিক্ষাশিবিরটি পরিচালনা করেছিলেন কমরেড শিবদাস ঘোষ। শিক্ষাশিবিরের আলোচনা কমরেড শর্মার মনে গভীর ছাপ ফেলে এবং তারপরই তিনি পার্টিতে যোগ দেন। দিল্লিতেই তিনি দলের কাজ শুরু করেন। ১৯৭৪ সালে তিনি এলাহাবাদ এ জি অফিসে বদলি হন এবং ট্রেড ইউনিয়নের কাজের মধ্য দিয়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের গভীর ভালবাসা ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন এবং সিভিল অডিট ব্রাদারহুড ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

১৯৭৫ সালে জরুরি অবস্থায় আন্দোলন করার অপরাধে এ জি অফিসের চাকরি থেকে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়। এরপর তিনি কলকাতায় কমরেড শিবদাস ঘোষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। কমরেড ঘোষের গভীর স্নেহ ও অনুপ্রেরণায় কমরেড শর্মার চরিত্রে দুর্লভ গুণাবলীর বিকাশ ঘটেএবং তিনি দল ও ট্রেড ইউনিয়নের কাজে নিজেকে সমর্পণ করেন। শ্রমিকশ্রেণীকে সংগঠিত করার কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি ইউ টি ইউ সি-এল এসের সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হন। এলাহাবাদে তিনিই জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অব অ্যাকশন (জে পি এ)-এর কাজের গোড়াপত্তন করেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সমস্ত শ্রমিকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে তাঁর দৃঢ়চেতা সংগ্রামের শাস্তিস্বরূপ ২০০২ সালে কর্তৃপক্ষ তাঁর চাকরিতে ছেদ ঘটায় এবং অবসরকালীন ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাঁর মাথা নত করাতে পারেনি। সংগ্রামী চরিত্র, বহুমুখী গুণাবলী এবং দলের প্রতি গভীর আনুগত্যে সমৃদ্ধ কমরেড এন কে শর্মা দলের কমরেডদের মধ্যেও অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।

গত ৫ই আগস্ট অসুস্থ শরীরে তিনি এলাহাবাদে নিরালা সভাঘরে কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন। অসুস্থতার কারণে তাঁর লিখিত বক্তব্য পাঠ করা হয়। এইটিই ছিল তাঁর সর্বশেষ জনসভা।

কমরেড শর্মার শেষযাত্রায় দলের কমরেডদের সঙ্গে বহু গুণমুগ্ধ শ্রমিক-কর্মচারীও অংশগ্রহণ করেন। শোকাহত এ জি কর্মচারীরা স্মরণসভার মধ্য দিয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি সংগ্রামী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

কমরেড শর্মার মৃত্যুতে দল অত্যন্ত যোগ্য ও মূল্যবান একজন সংগঠককে হারাল, শ্রমিকশ্রেণী হারাল তার একজন সংগ্রামী নেতাকে।

কমরেড নীহার মুখার্জীর শোকবার্তা

কমরেড নগেন্দ্র শর্মার জীবনাবসানে সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী নিচের শোকবার্তাটি পাঠান ঃ

''পার্টির উত্তরপ্রদেশ রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড নগেন্দ্র শর্মার মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ পার্টিজীবনে উত্তরপ্রদেশে দলের সাংগঠনিক বিকাশে প্রভূত অবদান রেখেছেন। এদেশে বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তোলায় তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ। তাঁর মৃত্যুতে দলের উত্তরপ্রদেশ সংগঠনের বিরাট ক্ষতি হল। দলের উত্তরপ্রদেশের শোকাহত কমরেডদের এবং তাঁর বেদনাহত পরিবারবর্গের প্রতি আমি আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি।''

[শোকবার্তাটি দলের উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সম্পাদক এবং কমরেড নগেন্দ্র শর্মার স্ত্রী কমরেড লতা শর্মার কাছে পাঠানো হয়।]

কমরেড এন কে শর্মা লাল সেলাম !

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net